Vidyasagar University Journal *of* History, Volume VII, 2018-2019, Pages: 111-131
ISSN 2321-0834

# রাজনৈতিক আন্দোলনে ঢাকার নারী :১৯০৫-১৯৪৭

আরিফা সুলতানা

*১৯০৫-১৯৪৭ ঢাকার নারী জাগৃতির গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব। এ পর্বের শুরুতে বাংলার অপরাপর অঞ্চলের মত ঢাকার নারীগণও বঙ্গভঙ্গের ঘটনায় প্রথম রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁরা বিদেশী বর্জন, স্বদেশী ভান্ডারে অর্থদান, অর্থ সংগ্রহ, বিপ্লবীদের সহায়তা করা প্রভৃতি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অংশ নিয়েছিলেন। প্রথম দিকে পুরুষদের আহ্বানে রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ নিলেও ধীরে ধীরে ঢাকার নারী রাজনীতি সচেতন হন। তাই ১৯২০ ও ১৯৩০ এর দশকে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বলা যায় এ ভূমিকা রাজনৈতিক আন্দোলনকে সফল করার ক্ষেত্রেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না- একই সঙ্গে তা ঢাকা এবং সংলগ্ন অঞ্চলের নারীদের অগ্রগতিতেও রেখেছিল অসামান্য অবদান।*

***মুখ্যশব্দ :*** *ঢাকা, রাজনীতি, আন্দোলন, আশালতা সেন লীলা নাগ।*

ঢাকা বর্তমানে মহানগর ও বাংলাদেশের রাজধানী। বুড়ি গঙ্গা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত এ মহানগর ঐতিহ্যবাহী এক প্রাচীন শহর। খ্রিষ্টীয় শাত শতকের পূর্বে এই নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। এর প্রাথমিক কালের ইতিহাস সুস্পষ্ট নয়, ফলে এ নগরীর পত্তন কবে এবং কীভাবে ঘটে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। গুপ্ত, পাল, বর্মন, সেন শাসনামলে ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সাভার, বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। মুসলিম যুগেও বিশেষত বাংলার স্বাধীনতা শাসনামলে (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) রাজধানী সোনারগাঁ'র নিকটবর্তী স্থান হিসেবে ঢাকার অপরিসীম গুরুত্ব ছিল বলে ধারণা করা যায়। প্রাচীন নথিপত্রে এমনও প্রমাণ আছে যে, একাদশ শতকের শেষের দিকে এ অঞ্চলে এক সুবৃহৎ জনপদ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তখন ঢাকা ছিল বিশ্বের প্রধান জনবহুল শহরগুলোর একটি। সতেরো শতকের প্রারম্ভে রাজধানী শহর হিসেবে ঢাকার আত্মপ্রকাশ। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামুলে ইসলাম খাঁন এর নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর (১৬১০খ্রীঃ)। প্রকৃতপক্ষে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ইসলাম খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাহাঙ্গীরনগর থেকেই রাজধানী শহর ঢাকার যাত্রা শুরু এবং ঐ আমলের সুদীর্ঘ একশ বছর রাজধানীর মর্যাদায় আসীন থাকে। বিস্তৃত মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীর গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরবর্তীতে আঠারো শতকের প্রারম্ভে (১৭১৭ খ্রিঃ) রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হলেও ঢাকায় একজন নায়েব নাযিম বা ডেপুটি গভর্ণর নিযুক্তি লাভ করেন। ফলে ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা হারালেও নায়েব নাযিমদের অবস্থিতির কারণে গুরুত্বপূর্ণ নগরী হিসেবে এর যাত্রা অব্যাহত থাকে। ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার শেষ নায়েব নাযিম গাজীউদ্দীন হায়দারের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ পর্যন্ত এই (নায়েব) নিযামত ব্যবস্থা চালু ছিল। মোগল শাসনের শাসনের শেষপর্বে উপমহাদেশে বিদেশীদের ব্যবস্থা-বাণিজ্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আর্মেনি, গ্রিক, পর্তুগীজ, ফরাসি, বৃটিশ প্রভৃতি বিদেশী জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ঢাকায় এসে কারখানা স্থাপন করে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পরে কোলকাতা

নগরীর বিকাশ শুরু হলে ঢাকার মর্যাদা হ্রাস পায়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে মুসলিম জাগরণ ও জাতীয়তাবাদী ধ্যান - ধারণার ক্রমবিকাশ ঘটে। এ সময়ে ঢাকার নবাব পরিবারের উদ্যোগে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা প্রশাসনিক সুবিধা সৃষ্টির জন্য বাংলাকে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। নবগঠিত প্রদেশ নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী হিসেবে ১৯০৫ থেকে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকায় আবার কিছুটা প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে।[১] এ প্রাণ চাঞ্চল্যের দুটো উৎস ছিল। একটি নতুন প্রদেশের রাজধানী হিসেবে এর প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং অন্যটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টির বিরুদ্ধে বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক আন্দোলন। এ আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বা স্বদেশী আন্দোলন নামে সমধিক পরিচিত ছিল। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেলেও বঙ্গভঙ্গের উপজাত রাজনৈতিক আন্দোলন তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে ঢাকাকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত বৃটিশ বিরোধী শক্তিশালী কেন্দ্র হিসেবে কর্মব্যস্ত রাখে। সমকালে ঢাকা জেলা ৪টি মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল। এ চারটি মহকুমা হল ঢাকা সদর, নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় নারায়ণগঞ্জ সদর, রূপগঞ্জ ও রায়পুরা, মুন্সিগঞ্জ সদর ও শ্রীনগর এবং মাণিকগঞ্জ মহকুমায় মাণিকগঞ্জ সদর, ঘিওর ও হরিরামপুর।[২] রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রতিটি থানার নারীদের অংশগ্রহণ থাকলেও প্রাচীন কাল থেকে শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুর এবং ঢাকা সদরের নারী সমাজ এ ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রণী। তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট রাজনীতির মত জনসংযোগমূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ সহজ বিষয় না হলেও স্বাধীনতা লাভের দুর্নিবার ইচ্ছায় তাঁর উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এতে যোগ দেন। সহজ ও স্বাভাবিকভাবে - অহিংস এবং সহিংস উভয় ধারার আন্দোলনেই ঢাকার নারী সমাজ যোগ দিয়েছিলেন এবং পালন করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অথচ এ সম্পর্কিত কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা লক্ষ করা যায় না। এ বিবেচনা থেকেই বর্তমান নিবন্ধ রচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২

আমরা জানি বৃটিশ কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতা হরণ করার একশ বছরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন কিছু কৃষক বিদ্রোহ ছাড়া বাংলায় বৃটিশ বিরোধী শক্তিশালী কোনো গণআন্দোলন গড়ে ওঠেনি। ১৮৫৭সালে সিপাহী বিদ্রোহ গণআন্দোলনে রূপ নেবার আগেই অবদমিত হয়েছিল। তাছাড়া সিহাপী বিদ্রোহ সম্পর্কে তৎকালীন বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণীর মনোভাবও ছিল বৈরী। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণীর ক্ষোভের প্রথম প্রকাশ ঘটে ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত প্রশ্নে। ইউরোপীয়ানদের বিরোধীতার মুখে এ বিল বহাল রাখার লক্ষ্যে ১৮৮৩ সালে বাঙালিরা প্রথম আন্দোলনে নামে। এ সময় বিক্রমপুরের মেয়ে বেথুন কলেজের কামিনী রায়ের নেতৃত্বে বেশ ক'জন ছাত্রী মিছিলে অংশ নেয়। তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক আন্দোলনে মেয়েদের এই অংশগ্রহণ স্বাভাবিক কোনো ঘটনা ছিল না। এটা ছিল উদার মতাদর্শের অনুসারী ব্রাহ্ম ধর্ম এবং মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মিথস্ক্রিয়ার ফল। এর বাইরে গোটা নারী সমাজ ছিল অবরোধের ঘেরাটোপে বন্দী। রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁদের কোনো অংশ গ্রহণ ছিল না। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ঘটনা এ সব নারীদের অনেককে অবরোধের ঘেরাটোপ থেকে বাইরে নিয়ে আসে।

বিভিন্ন কারণে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর মনঃপুত হয়নি। তারা বঙ্গভঙ্গ রদ করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা থেকে নারী সমাজকে তাদের সহযোগী হিসেবে এ আন্দোলনে নিয়ে আসে। এক জন দু'জন নয়, শত শত বাঙালি নারী এ সময় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মূল এজেন্ডা ছিল 'স্বদেশী ও বয়কট'। পরে এটি এটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এই দ্বিবিধ কর্মসূচীতে নারীরা কখনও প্রত্যক্ষ এবং কখনো পরোক্ষভাবে যোগদান করেন। চরকায় সূতা কেটে তাঁতে কাপড় বয়ন, স্বদেশী ভান্ডারে স্বর্ণলঙ্কার দান, বিদেশী বস্ত্র, প্রসাধনী ইত্যাদি বর্জন, স্বদেশী সভায় যোগদান ইত্যাদি কর্মকান্ডের মধ্যে তাদের অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ ছিল।

তাছাড়া বিপ্লবীদের আশ্রয়দান, অর্থ সাহায্য করা, তাদের অস্ত্র, গোপন লিফলেট ইত্যাদি লুকিয়ে রেখে কিংবা গোপনে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেবার মত কাজে তারা যুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়াও কোনো কোনো শিক্ষিত বাঙালি নারী সাহিত্য ও সাংবাদিক প্রয়াসের মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে অধিক সংখ্যক জনগণের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে সচেষ্ট ছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার দিন থেকেই বাংলার অপরাপর অঞ্চলের মত ঢাকায়ও স্বদেশী প্রচার ও বয়কট প্রসার উপলক্ষে আয়োজিত সভা সমাবেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী অংশগ্রহণ করতে থাকেন। সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে এ জাতীয় অনেকগুলো সভার বিবরণ পাওয়া যায়। এসব বিবরণ থেকে দেখা যায় বিক্রমপুরের গাঁওদিয়া, শেখরনগর ও রসুনিয়া গ্রামে, ঢাকার মুড়াপাড়ায়, নবাবগঞ্জের দোহারে, মুন্সিগঞ্জ সদরে ও মানিকগঞ্জের বেতিলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভায় শতাধিক নারী যোগদান করেন।[৩] প্রথম দিকে এসব সভায় পর্দার আড়ালে নারীদের জন্য বসার ব্যবস্থা করা হলেও কিছু দিন পর পর্দার অবসান ঘটে। এমনকি নারীরাই উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন সভার আয়োজন করতে থাকেন। এসব সভায় তারা নিজেরা যেমন বক্তৃতা করতেন তেমনি কখনো কখনো দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গকে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন। আমন্ত্রিত বক্তাগণ নারীদের বর্তমান আন্দোলনে অংশগ্রহণের উপযোগিতা সম্পর্কে বুঝিয়ে বলতেন। মাণিকগঞ্জের বায়রা, বিক্রমপুরের তেওতা, ফেগুনাসার ও কামারখাড়ায় এ জাতীয় সভা হয়েছিল বলে জানা যায়।[৪] এসব সভা স্থানীয় জমিদার বা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হতো এবং শিক্ষিত নারীগণই সচরাচর এতে সভাপতিত্ব করতেন। যেমন ফেগুনাসারের সভায় আড়াইশত নারী উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন শশীমুখী ঘোষ। কামারখাড়ায় অন্যূন পাঁচশত নারীর সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাবু মধুসূদন সেনের স্ত্রী (তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি)। বায়রার সভায় নেতৃত্ব দেন সুশীলাসুন্দরী গুপ্ত। এ সময় যে সব বিখ্যাত ব্যক্তি নারীসভার আমন্ত্রণে ঢাকা আসেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। ১৯০৬ সালে কামার খাড়ায় প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে স্ত্রী জাতির কর্তব্য এবং কিভাবে নারীদের দ্বারা এ আন্দোলন সফল হতে পারে সে বিষয়ে হৃদয় স্পর্শী বক্তব্য রাখেন। এ বক্তব্য নারীদের মধ্যে এমন ভাবাবেগের সৃষ্টি করে যে তারা তৎক্ষণাৎ তাদের সাথে থাকা সামান্যতম বিলাতী সামগ্রীও নষ্ট করে ফেলেন। তারা জীবনে আর কখনো বিলাতী দ্রব্য স্পর্শ করবেন না এবং স্বামী পুত্রদেরও তা গৃহে আনতে দেবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ঢাকার নারীদের এমন দৃঢ়চিত্ত মানসিকতা বিপিনচন্দ্রকে অবাক করেছিল। তিনি বোষ্টন ও ইংলেন্ডের নারী সভা ছাড়া এমন সভা আর কোথাও দেখেননি বলে মন্তব্য করেছিলেন।[৫]

সভা সমাবেশে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও নারীরা ব্যক্তিগতভাবে এবং কখনও কখনও সমষ্টিগতভাবে কিছু প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের দিন থেকে বিভিন্ন স্থানে নারীরা চরকার প্রচলন করেন। বিক্রমপুরের আউট শাহীতে নারীগণ একটি সমিতি স্থাপন করেন। সমিতির পক্ষ হতে চল্লিশটি চরকা কিনে সূতা প্রস্তুতের জন্য তা গ্রামের নারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।[৬] নবশশী দেবী, শুশীলা সেন, কমলেকামিনী গুপ্তা প্রমূখ এর উদ্যোক্তা ছিলেন। এছাড়াও তারা স্বদেশী ভান্ডার স্থাপন করে জাতীয় তহবিল সংগ্রহে তৎপর হন।[৭] বায়রা, মানিকগঞ্জে সুশীলাসুন্দরী গুপ্তার নেতৃত্বে চরকায় সূতা প্রস্তুতের উদ্যোগ নেয়া হয়।[৮]

স্বদেশী প্রচারের সাথে সাথে ঢাকার নারী সমাজ বিদেশী সামগ্রী বর্জনের ব্যাপারেও সংকল্পবদ্ধ হন। এ সময় নবশশী দেবী বিলাতী কাপড় বর্জনের সংকল্পপত্রে তাঁর দৌহিত্রী এবং পরবর্তীকালে পূর্ববাংলার বিখ্যাত নেত্রী আশালতাকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে তাকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। গ্রামের অন্যান্য মেয়ে ও বৌদের বিদেশী বর্জন আর স্বদেশী ব্যবহারের প্রতিজ্ঞাপত্র সই করাবার ভারও তিনি আশালতার উপর অর্পন করেন। [৯]

সভা সমাবেশে যোগদান কিংবা অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা ছাড়াও সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে বাঙালি নারী আন্দোলনে

সম্পৃক্ত হয়েছিলেন এবং অন্যদের সংযুক্ত করেছিলেন। বিশেষ করে যারা তখনও বাড়ীর দৌহদ্দি ডিঙিয়ে বাইরে আসেননি তাদের মনে স্বদেশপ্রেম জাগাতে এবং আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ ঘটাতে সাহিত্য কর্ম অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ভারত নারী নামক মাসিক পত্রিকাটির ভূমিকা আলোচনার দাবি রাখে। পত্রিকাটির সম্পাদক সরযুবালা দত্ত নিজে আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন এবং তার পত্রিকায় স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করে অন্যদের অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। তাঁর পত্রিকার দুজন লেখিকা আমোদিনী ঘোষ ও শতদলবাসিনী দেবী নিয়মিত প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে নারীদের আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানান।[১০] ঢাকার শরৎবাসিনী দেবী নিয়মিত প্রবন্ধ রচনায় বিদেশী বণিকদের এক কানাকড়িও না দেবার আহ্বান জানান।[১১] জীবনবালা দেবীও একই মত পোষণ করেন। তাঁর মতে 'স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করে নিজ দেশের বণিকদের সহায়তা করাই হচ্ছে প্রকৃত দেশপ্রেমীর কাজ।'[১২] এভাবে ঢাকার নারীসমাজ স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য নিজেদের যোগ্য করে তোলেন।

৩

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ঢাকার নারী সমাজ যে সক্রিয়তা প্রদর্শন করে পরবর্তী এক দশকে তা অব্যাহত থাকেনি। এ সময় বৈপ্লবিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠলেও জাতীয়বাদী আন্দোলন স্থগিত ছিল। ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয় ইত্যাদি বিষয়কে উপলক্ষ করে ভারতব্যাপী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে পুনরায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। বাংলাও সে আন্দোলনে যুক্ত হয়। বস্তুত কংগ্রেসের নেতৃত্বেই বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। বাংলাও সে আন্দোলনে যুক্ত হয়। বস্তুত কংগ্রেসের নেতৃত্বেই বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। কাউন্সিল বর্জন, পদক ও উপাধি বর্জন, সরকারী চাকুরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন, বিদেশী বস্ত্র ও মদের দোকানে পিকেটিং, চরকা ও খদ্দর প্রচলন, তিলক স্বরাজ্য ভান্ডারে অর্থ ও অলংকারাদি দান ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে।[১৩] স্বদেশী আন্দোলনের মত এবারও নেতৃবর্গ নারী নেতৃত্বের উত্থান ঘটে। এদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি ১৯২০ সালে নারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলে রাজনীতিতে এক নতুন প্রবাহ নিয়ে আসেন।[১৪] তাঁর অনুকরণে পরবর্তী সময়ে বাংলার বিভিন্ন জেলায় অসহযোগ কর্মসূচীকে সফল করার জন্য নারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা হয়। অসহযোগ আন্দোলন শুরুর প্রাক্কালে কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী বাসন্তী দেবী এবং বোন উর্মিলা দেবী কংগ্রেস রাজনীতিতে যোগ দেন। তাদের সাথে যুক্ত হন ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতা বসন্তকুমার মজুমদারের স্ত্রী হেমপ্রভা মজুমদার। সভাসমিতিতে প্রচারণা এবং শোভাযাত্রা বের করা ছাড়াও এরা কলকাতায় 'নারী কর্মমন্দির' নামক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে বিদেশী বস্ত্র ও মদের দোকানে পিকেটিং, খদ্দর বিক্রি ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলনকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যান যাতে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়।[১৫]

কলকাতাকে কেন্দ্র করে নারী সমাজ যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছেন তখনও বাংলার অপরাপর অঞ্চলের নারীদের এ আন্দোলনে যোগ দিতে দেখা যায় না। ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে সহযোগিতা বর্জন আন্দোলন শুরু হলেও[১৬] এ আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ১৯২১ সালের শেষ দিক থেকে শিক্ষিত নারীরা যে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে সচেতন হয়ে উঠছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯২১ সালের ৭ ডিসেম্বর কলকাতার বড় বাজারে সভা করার সময় পুলিশ উর্মিলা দেবী, বাসন্তী দেবী ও সুনীতি দেবীকে গ্রেফতার করলে এর প্রতিবাদে ইডেন ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্রীরা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলেজ বয়কট করে।[১৭] মুন্সিগঞ্জে সরকারী নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ঢাকার উকিল যোগেন্দ্রচন্দ্র গুহ

ঠাকুরতার কন্যা সভা করতে যান এবং বক্তৃতা করার সময় পুলিশের বাঁধার সম্মুখীন হয়ে মঞ্চ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।[১৮] মানিকগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মনসাচরণ ব্যাণার্জি নামক ১২ বছরের এক বালককে দু'মাসের কারাদন্ড দিলে তার মা তাকে যে চিঠি দেয় সেখানে বলা হয় -

> "বাবা মনসা। তোমার জেল হওয়ার সংবাদে আমরা অতিশয় আনন্দিত। তুমি দেশের ও দশের জন্য কারাযন্ত্রণাকে সাদরে বরণ করিতে পেরেছ দেখে আমি তোমার মা হয়ে নিজকে ভাগ্যবতী মনে করিতেছি। আমি ভগবৎমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি যে উদ্দেশ্যে এ কঠোর কারাদন্ড হাসতে হাসতে বরণ করে নিয়েছ সেই মহৎ উদ্দেশ্যে সফল কাম হয়ে সকলের আদরনীয় হও। কোন মহৎ কাজ করিতে হইলে তার জন্য কঠোর সাধনার দরকার। আমি মনে করি তুমি কারাগারে যাও নাই, সেই সাধনাগারে গিয়াছ। সর্ব্রদা ভগবানকে স্মরণ রাখিও। তাহাকে যে কোন অবস্থায়ই ভুলিও না। তিনি মঙ্গলময়, তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।"[১৯]

এ জাতীয় কর্মকান্ডের বাইরে অসহযোগ আন্দোলনে ঢাকার নারীসমাজের অংশগ্রহণের আর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান দুই নেত্রী উর্মিলা দেবী ও বাসন্তী দেবী ছিলেন এ জেলারই সন্তান।কোলকাতা তাদের কর্মকেন্দ্র হলেও সমগ্র বাংলার জন্য তারা ছিলেন অনুকরণীয়। কোলকাতার পর ঢাকাই ছিল তাদের আন্দোলনের কেন্দ্র। বাসন্তী দেবী ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটিরও সদস্য ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২১ সালের মার্চ মাসে তাঁকে ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটি হতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য নিযুক্ত করা হয়।[২০] বস্তুতঃ এদের কার্যকলাপে অনুপ্রাণিত হয়ে ঢাকার নারী সমাজ অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করার পরে এতদ্অঞ্চলের রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তী আন্দোলনের শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলেন।

## ৪

অসহযোগ আন্দোলন যখন শাসক গোষ্ঠীকে ভীত করে তুলছিল ঠিক সেই মুহূর্তে চৌরিচৌরার অহিংস ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৯২২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধীজী হঠাৎ করেই অসহযোগ আন্দোলন রহিত ঘোষণা করেন। তাঁর পরিবর্তে তিনি কর্মীদের বেশী করে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। এ পর্যায়ে বাংলার রাজনীতিতে মেয়েদের উৎসাহ নতুন গতিবেগ লাভ করে। ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি বাসন্তী দেবীর অভিভাষণ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই অভিভাষণে তিনি বর্তমান আন্দোলনকে সফল করার পথে চরকার প্রচলনই প্রথম ও প্রধান কাজ' বলে ঘোষণা করেন।[২১] উক্ত অধিবেশনের বাসন্তী দেবী আনিত মদ ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। তাঁর এ ঘোষণা প্রমাণ করে যে, অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলেও বাংলার জনগণ বৃটিশ বিরোধিতা থেকে সরে আসেনি এবং তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখতে সংকল্পবদ্ধ। প্রাদেশিক সম্মেলনের পর কোলকাতাসহ বিভিন্ন শহরে বিদেশী বস্ত্র ও মদের দোকানগুলোতে পিকেটিং শুরু হয়। পুলিশ পিকেটারদের গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করতে থাকে। এ পর্যায়ে ঢাকায় বেশ কিছু নারী আন্দোলনে যোগদান করেন। আইন অমান্য করার উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালের মে মাসে ঢাকার প্রসিদ্ধ সত্যাগ্রহী অতুলচন্দ্র সেনের পত্নীর সভাপতিত্বে এক বিরাট নারী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অমিয়াদেবী ও কুমারী অমিয়বালা দত্তগুপ্ত বর্তমান আন্দোলনে নারীদের করণীয় সম্পর্কে দু'টি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাস্থলে বিলাতী কাপড় পুড়িয়ে নারীগণ স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারের অঙ্গীকার করেন। তাছাড়া সত্যাগ্রহীদের সাহায্যার্থে অমিয়া দেবী তার সোনার হার ও অন্যান্য অনেক নারী তাদের অলঙ্কার দান করেন।[২২] আশালতা সেন প্রতিষ্ঠিত 'গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি'র সত্যাগ্রহীগণও এ সময় ঢাকা

এবং নারায়ণগঞ্জে বিলাতী মদ ও বস্ত্রের দেকানে পিকেটিং-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন। নারায়নগঞ্জে পিকেটিং করার সময় সরযূগুপ্তা, কামিনী বসু, প্রতিভা সেন ও সুনীতি বসুকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তিনমাস সাজা ভোগ করার পর তারা ঢাকা জেল থেকে মুক্তি পান। তাঁদের কারাভোগকালীন সময়ে গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতির অন্যান্যরা সভা-সমাবেশ ও শোভাযাত্রা করে নারী আন্দোলনের ধারাটিকে অধিক সচল রাখেন।[২৩]

পুলিশী নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে এ কালপর্বে কংগ্রেস নেতৃবর্গ নারীদের গান্ধীর প্রস্তাবকৃত গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। বিভিন্ন সভা সমিতিতে বিশেষ করে নারী সভায় তারা নারীদের খদ্দর ব্যবহার ও চরকায় সূতা কাটার এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীয় আয়োজন করে এসব কাজ জনপ্রিয় করার পরামর্শ দেন। স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে উর্মিলা দেবী, কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ প্রফুল্ল কুমার ঘোষ, জে, এম, দাশগুপ্ত, হেমপ্রভা মজুমদার, যশোদানন্দী গোস্বামী এবং অন্যান্য অনেকে এ সময় খদ্দর ও চরকা প্রচলনের পক্ষে প্রচারাভিযান চালান। এ প্রয়াসের অংশ হিসেবে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয় বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী, আউটসাহী, আবদুল্লাহপুর এবং ঢাকার গেন্ডারিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে।[২৪] জাতীয় নেতাদের মধ্যে ১৯২৫ সালে গান্ধী ঢাকা সফর করেন।[২৫] ১৯২৬ সালে সরোজিনী নাইডুও পূর্ববাংলায় এসে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সফল করেন। ঐ সফরে তিনি স্বরাজ অর্জন, হিন্দু মুসলিম ঐক্য, খদ্দর ব্যবহার, অস্পৃশ্যতা নিবারণ ও স্বদেশজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের জন্য নারীদের নিকট বিশেষ আবেদন জানান।[২৬] এসব আবেদনের ফলস্বরূপ নারীগণ গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করেন। এ ক্ষেত্রে ঢাকার আশালতা সেনের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

আশালতা সেন স্বদেশী আন্দোলনের সময় নানী (দিদিমা) নবশশী দেবীর সাথে বাড়ী বাড়ী যেয়ে নারীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করলেও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন না। অসহযোগ আন্দোলন থামিয়ে গান্ধী যখন গঠনমূলক কাজে কর্মসূচী দিলেন সেই সময় তিনি তাঁর আত্মীয় বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী নিবারণ দাশগুপ্ত ও ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের উৎসাহে ফরিদপুরে তাঁর মাসী প্রমোদ সেন ও মোসো বীরেশ্বর সেনের কাছে 'খদ্দরের' কাজ শিখতে যান। ফিরে এসে তিনি তাঁর শ্বশুরের সহায়তায় বাড়ীতে 'শিল্পাশ্রম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এখানে চরকা ও তাঁত বসিয়ে তিনি স্থানীয় মেয়েদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেন। ১৯২২ সালে জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করে তাঁর এ কাজের স্বীকৃতি দেয়া হয়। গয়া অধীবেশনে তিনি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে কংগ্রেসের No Changer অর্থাৎ বিধানসভা বয়কটকারীদের সমর্থন করেছিলেন।[২৭] গয়া থেকে ফিরে এসে তিনি স্থানীয় মেয়েদের ভেতর দেশপ্রেম এবং গান্ধীর বাণী ও কর্মপন্থা প্রচার করার উদ্দেশ্যে সুশীলা সেন, গিরিবালা দেবী, সমরাগুপ্তা ও সরযূগুপ্তার সহায়তায় 'গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি' গঠন করেন। এ সমিতির সভ্যগণ খদ্দরের বস্তা নিয়ে দূর-দূরান্তর যেতেন এবং খদ্দর বিক্রির সাথে সাথে গান্ধীজীর বাণী প্রচার করতেন। এ সময় ইডেন স্কুলের ছাত্রী ময়মনসিংহের পুষ্পময়ী বসু আশালতা সেনের সংস্পর্শে এসে কংগ্রেসের কাজ আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২-২৩ সালে তিনি খদ্দর বিক্রি, বিলাতি দ্রব্য বর্জন, পিকেটিং ইত্যাদি কাজে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন।[২৮] গেন্ডারিয়া নারী সমিতির পক্ষ থেকে প্রতিবছর আশালতা সেনের বাড়ির মাঠে শিল্পমেলার আয়োজন করা হতো। এখানে দেশীয় শিল্প প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের পাশাপাশি বানানো হতো 'গান্ধীমন্ডপ'। সেই মন্ডপে গৌতম বুদ্ধ থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত ভারতীয় ধর্মীয় ও জন-নেতাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে মূর্তি এবং ছবির প্রদর্শনী করা হতো। বুদ্ধ দেব এবং মহাপুরুষদের শিক্ষার সঙ্গে গান্ধীর বাণীর যে সাদৃশ্য রয়েছে সে সম্বন্ধে প্রদর্শনীতে আগত দর্শকদের বোঝানো হতো।[২৯]

খাদি প্রচারে আশালতা সেনের উপযুক্ত উদ্যোগকে মূল্যায়ন করে ১৯২৫ সালে তাঁকে 'নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের' সদস্য নির্বাচিত করা হয়। এ নতুন দায়িত্ব তাঁকে আরও বেশী উদ্যমী করে তোলে। গান্ধীপন্থী আন্দোলনে নারী কর্মী তৈরী করার জন্য ১৯২৭ সালে তিনি ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সহায়তায় 'কল্যাণ কুটির" নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান

গড়ে তোলেন। তাছাড়া গান্ধীজীর হরিজন উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে ১৯২৯ সালে তিনি সরমগুপ্তার সহায়তায় ঢাকার জুরাইনে একটি হরিজন বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। গান্ধীজীর পরবর্তী আন্দোলনের অংশ হিসেবে এ সময় থেকেই আশালতা সেন ও তাঁর সহযোগীরা 'ম্যাজিক ল্যান্টার্ন' নিয়ে গ্রামে গ্রামে সভা করে জনসংযোগ শুরু করেন। এসময় তারা বক্তৃতার মাধ্যমে একদিকে জনসাধারণের স্বাস্থ্য, কৃষি, কুটির শিল্প ইত্যাদির কি করে উন্নতি করা যায় তা শেখাতেন, অন্যদিকে তাদের সমাজসংস্কার ও দেশের স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হতো।[৩০] এসব কার্যাবলীর মাধ্যমে এ কালপর্বে ঢাকার রাজনীতিতে সম্ভানাময় এক নেত্রী হিসেবে আশালতা সেনের আবির্ভাব ঘটে। অনুরূপভাবে কাছাকাছি সময়ে ঢাকার রাজনীতিতে আবির্ভূত হন নারী নেত্রী লীলা নাগ।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর পরই ঢাকায় লীলা নাগ তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করেন। এ সময় নারী সমাজে কংগ্রেস ও গান্ধীজীর অসামান্য প্রভাব থাকলেও লীলা নাগ কংগ্রেস রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন। তিনি গান্ধীর অহিংস ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সফলতার বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন। তবে ভারতীয় সমাজ গঠনে গ্রামীণ অর্থনীতির পূর্ণবিন্যাস এবং এর প্রধান অবলম্বন হিসেবে কুটির শিল্পের বিকাশ সাধণ- গান্ধীর এই গঠনমূলক কর্মসূচীর প্রতি তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন। তার বিবেচনায় সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা লাভ সুদূর পরাহত। কিন্তু সে সময় বিপ্লবী দলে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় লীলা নাগ রানী উন্নয়নের লক্ষ্যে তার কর্মশক্তি প্রয়োগ করেন। ১৯২৩ সালে 'দীপালী সংঘ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি নারী শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক কার্যাবলী শুরু করেন।[৩১] তবে তাঁর মূল লক্ষ ছিল নারী সমাজকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে তোলা। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রতি মাসে দ্বীপালী সংঘে আলোচনার ব্যবস্থা করেন। নারী বিষয়ক বিভিন্ন বক্তৃতা ছাড়াও সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে এখআনে আলোচনা করা হতো। এসব আলোচনার জন্য তিনি সমকালীন কংগ্রেস নেতাদের আমন্ত্রণ জানাতেন। ছাত্রী সমাজকেও দেশের কাজে যুক্ত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন লীলা নাগ। তাই ১৯২৬ সালে তিনি 'দিপালী ছাত্রী সংঘ' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে এটিই ছিল প্রথম ছাত্রী সংগঠন।[৩২] দিপালী সংঘ পরিচালিত স্কুলের ছাত্রী ছাড়াও অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা এখানে যোগ দিতে পারতেন। এখানে ছাত্রীদের আত্মরক্ষা ও শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। শরীরচর্চার পাশাপাশি এখানে মেয়েদের লাঠি, ছুরি ইত্যাদি খেলা ও আত্মরক্ষার জন্য জুজুৎসু কৌশল শেখানো হতো। এসব কাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের দেশের কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা। শারীরিক যোগ্যতার পাশাপাশি মেয়েদের মাঝে দেশাত্মবোধ জাগাতে লীলা নাগ ছাত্রী সঙ্ঘে 'স্টাডি সার্কেল' গঠন করেন এবং সেখানে দেশপ্রেমমূলক গ্রন্থ পাঠের ব্যবস্থা করেন। এ সংগঠনের প্রতি ছাত্রীদের আগ্রহ ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এর একটি শাখা সংগঠনও স্থাপন করা হয়েছিল।[৩৩] লীলা নাগের এ সব প্রয়াসে ঢাকার নারী সমাজে তাঁর ও দীপালী সঙ্ঘের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। দীপালী সঙ্ঘের বহুমূখী কাজে ঢাকার নারীরা দ্রুত সাড়া দেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা দু'শো ছাড়িয়ে যায়। দীপালী সঙ্ঘ পরিচালনায় ঢাকার যেসব নারী লীলা নাগকে সহায়তা করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন উষা রায়, শকুন্তলা, রেণু সেন, আশালতা সেন, সুষমা দাস, লাবণ্য দাশগুপ্ত, সুশীলা দাসগুপ্ত, অশ্রুকণা সেন, বীণাপানি রায়, হেলেনা দত্ত, প্রমীলা গুপ্ত, প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।[৩৪]

সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনেও ঢাকার নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ লক্ষ করা যায়। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন শাসনতান্ত্রিক মীমাংসার প্রশ্নে ভারতে এসেছিল। এ কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না রাখার প্রতিবাদে ৩ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস দেশব্যাপী আহ্বান করেছিল হরতাল। এ কর্মসূচি সফল করতে ঢাকার নারীগণ তৎপর হয়েছিলেন। বিশেষ করে ইডেন কলেজের ছাত্রীরা এ কর্মসূচি সফল করার জন্য যথেষ্ট সক্রিয়তা প্রদর্শন করে। তারা অধ্যক্ষা মিস রাইটের নিষেধাজ্ঞা বিবেচনায় না নিয়ে পালন করে হরতাল। নিষেধাজ্ঞা অমান্যের জন্য অধ্যক্ষা তাদের ক্ষমা ভিক্ষা

চাইতে বললেও ছাত্রীরা তাতে অসম্মতি জানায়।[৩৫]

এ পর্যায়ে সাইমন কমিশন বর্জন, নেহেরু রিপোর্ট অগ্রাহ্য, কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ এবং কংগ্রেস কর্তৃক অহিংস আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উত্তরোত্তর উত্তেজনাপূর্ণ করতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে নারীরা পূর্বের চেয়ে অধিক সংখ্যায় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। নারীদের আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেয়ার জন্য ১৯৩০ সালের ১৩ মার্চ, কলকাতায় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার মত ঢাকা ও বাংলার অপরাপর মফঃস্বল শহরের নারীগণও কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা প্রকাশ থেকে করোনেশন পার্কে অনুষ্ঠিত একটি নারী সভার কথা জানা যায়। এ সভায় শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ভদ্র নারী যোগদান করেন। সভায় কয়েকজন ভদ্র নারী ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও ভারতবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বিশেষ করে সতের বছরের বাসন্তী দাসগুপ্তা স্বদেশজাত দ্রব্যের বহুল প্রচলন, স্বরাজ, ভারত নারীর আদর্শ ও কর্তব্য এবং অহিংস আন্দোলন সম্পর্কে এক ঘন□ধরে অবিচলচিত্তে প্রকাশ্য জনসভায় যেভাবে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত জনতাকে তা মুগ্ধ করে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক মন্তব্য করেন।

> "যে হিন্দু নারী এতদিন অসূর্য্যস্পশ্যা অবস্থায় দিন কাটাইয়াছে তাহার কি প্রকার প্রাণের টানে ঘরের বাহির হইয়া প্রকাশ্য জনসভায় এরূপভাবে বক্তৃতা করিয়ে দাঁড়াইতেছে তা অবশ্যই ভাবিবার কথা। ভারতের মাতৃজাতি যদি এরূপভাবে জাগ্রত হয় তবে তাঁহাদের সন্তানগণও যে আর আরামে ঘুমাইবার চেষ্টা করিবে না তাহা ঠিক। মায়ের হৃদয় সরস থাকিলে সন্তানেরা দু□র্ব্বল হইতে পারিবেনা। মাতৃজাতির এই জাগরণ মঙ্গলময় হউক ইহাই প্রার্থনা।"[৩৬]

আইন অমান্য আন্দোলনে ঢাকার নারীদের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুজাতা রায়। তিনি একই বিদ্যালয়ের আরও দু'জন নারী শিক্ষককে নিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এ অভিযোগে শিক্ষা বিভাগ তাদের বরখাস্ত করতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ পালন করা না হলে বিদ্যালয়কে প্রদত্ত মাসিক ৫০০শত টাকা সরকারি সাহায্য বন্ধের হুমকিও একই সঙ্গে প্রদান করা হয়। প্রথমাবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ নির্দেশ পালন না করলে শিক্ষা বিভাগ সাহায্য বন্ধ করে দেয়। পরে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের সাথে এ মর্মে সমঝোতার আসে যে, অধ্যক্ষ সুজাতা রায় বিদ্যালয়ের সাথে কোন সংশ্রব রাখবেন না। কিন্তু সুজাতা রায় এ নির্দেশ মানতে রাজী না হলে কর্তৃপক্ষ তাকে পদচ্যুত করে।[৩৭] এর প্রতিবাদে ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের চেষ্টায় স্কুলে ধর্মঘট শুরু হয়। এমতাবস্থায় মীমাংসার জন্য কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় ১৫ দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।[৩৮] শেষ পর্যন্ত সুজাতা রায়কে স্বপদে বহাল রাখার সিদ্ধান্তের পর স্কুলের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। অন্যদিকে পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহক সমিতির প্রতি অভিভাবক বর্গের অনাস্থার প্রেক্ষিতে গঠিত হয় নতুন কমিটি।[৩৯] ইতোমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্য গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতিকে নিষিদ্ধ করে দিলেও এর তৎপরতা বন্ধ হয় না। এ সমিতির কর্মীগণ আগের মতই পিকেটিংসহ বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। এ পর্যায়ে পিকেটিং করার অভিযোগে সুহাসিনী দেবী ও সুর্যলতা দাশগুপ্তকে গ্রেফতার করে ছয় মাসের কারাদন্ড দেয়া হয়। বিচারকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখা হয় অমিয়াবালা দেবী ও স্বর্ণদেবীকে।[৪০]

ঢাকায় আশালতা সেন ১৯৩০ সালের মার্চ মাসের সরলা এবং সরযূ গুপ্তার সাহায্যে 'সত্যাগ্রহী সেবিকাদল" গঠন করেছিলেন। গঠনের পরেই এ দল আন্দোলন শুরু করে।[৪১] এ দলের সদস্যগণ লবন আইন অমান্য করার উদ্দেশ্যে এপ্রিল মাসে নোয়াখালী যান এবং সেখান কার সমুদ্র থেকে নোনোজল সংগ্রহ করে ঢাকার করোনেশন পার্কে চুলা

জালিয়ে সর্বসমক্ষে লবন তৈরী করে। ব্রিটিশ আইনের বিরুদ্ধে এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ শত শত জনতার সম্মুখে পরিচালিত হয়। উপস্থিত জনতা প্রতিযোগিতা করে তৈরী লবন কিনে নেয়।[৪২] এ পর্যায়ে গ্রেফতার এড়িয়ে আশালতা সেন বাংলার বিভিন্ন এলাকায় আইন অমান্য আন্দোলন প্রচার ও সংগঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সরলাবালা দেবীর আহ্বানে তিনি প্রথমে সিলেটে যান এবং নানা জায়গায় বক্তৃতা ও সংগঠনমূলক কাজ করেন। এরপর সুধাময়ী দাসগুপ্তা, শশীবালা দেবী ও পঙ্কজিনী দেবীর নিমন্ত্রণে তিনি বগুড়া, ময়মনসিংহ, জামালপুর এবং নানা জায়গায় বক্তৃতা ও সংগঠনমূলক কাজ করেন। এরপর সুধাময়ী দাসগুপ্তা, শশীবালা দেবী ও পঙ্কজিনী দেবীর নিমন্ত্রণে তিনি বগুড়া, ময়মনসিংহ, জামালপুর এবং চাঁদপুরে সাংগঠনিক তৎপরতা চালান। এ সময় বহু নারী সত্যাগ্রহী সেবিকা দলে যোগ দান করেন।[৪৩] পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করলেও আশালতা সেনের মূল কর্মস্থল ছিল ঢাকার বিক্রমপুর। এখানেই তিনি সাংগঠনিক কাজে অধিক সময় ব্যয় করেন। তাঁর সঙ্গে সত্যাগ্রহী সেবিকা দলের বাসন্তী দেবীসহ কতিপয় নারী কর্মী বিক্রমপুরের নানা স্থানে কংগ্রেসের বাণী প্রচারে নিয়োজত হন।[৪৪] তাছাড়া এতদ্অঞ্চলের অনেক নারী আইন অমান্য আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিক্রমপুরের হল্দিয়া, কনকসার, ভাগ্যকূল, বাহেরক, মিতারা, নশঙ্কর, হাসাইল, নয়না, রাউৎভোগ, তাজপুর, আবীরপাড়া, রসুনিয়া, জৈনসার, ইছাপুরা, মালখাঁনগর, পাইকপাড়া, আউটশাহী, সিলিমপুর প্রভৃতি গ্রামের নারীগণ লবন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার দান করেন। পাইকপাড়া, মালখাঁনগর, ইছাপুর, তাজপুর প্রভৃতি গ্রামের নারীগণ সপ্তাহের পর সপ্তাহ গ্রাম হতে গ্রামান্তর ঘুরে অর্থ ও মুষ্টিভিক্ষা স্থানীয় সত্যাগ্রহ কেন্দ্রে দান করেন। সভা ও শোভাযাত্রার ব্যাপারেও নারীদের উৎসাহ ছিল সীমাহীন। পল্লীর চিরাচরিত পশ্চাদপদ ধ্যান ধারণাকে উপেক্ষা করে নারীগণ দূর দূরান্ত থেকে (কখনও কখনও ৪/৫ মাইল পথ) পায়ে হেটে 'বন্দেমাতরম' জয়ধ্বনি দিতে দিতে সভায় যোগ দিতেন। সভা শেষ হতে কখনও কখনও বেশ রাত হয়ে যেতো। এসব বাঁধা নারীরা অনায়াসে উপেক্ষা করেছেন। শুধু সভায় যোগদান নয় বিক্রমপুরের অনেক নারী গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করে আন্দোলনে অধিক সংখ্যক নারীকে যুক্ত করেছেন। এদের মধ্যে আউটশাহীর প্রিয়বালা গুপ্তা, জৈনসারের হিরণবালা সেন, জোড়াদেউলের কিরণবালা রুদ্র, পাইকপাড়ার বিরজা বসু, হলদিয়ার সরযুবালা দেবী, পারুলবালা সেন, জোড়াদেউলের কিরণবালা রুদ্র, পাইকপাড়ার বিরজা বসু, হলদিয়ার সরযূবালা দেবী, পারুলবালা চন্দ, স্নেহলতা রায়, ননীবালা চন্দ প্রমূখ উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিকে সভা সমিতি শোভাযাত্রা বা মুষ্টিভিক্ষার মধ্যে নারীদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকলেও কয়েকমাস পরে বিশেষতঃ নভেম্বর -ডিসেম্বর মাসে বিক্রমপুরে যখন চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ ও ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলন শুরু হয় তখন নারীরা এতে যোগদান করেন, সেই সাথে বস্ত্র ও মদের দোকানে পিকেটিং-এ অংশ নেন। এ সময় বিক্রমপুরে পিউনিটিভ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। পুলিশি নির্যাতনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নারীরা নির্ভয়ে আন্দোলনে যোগ দেন।[৪৫] বিক্রমপুরে ইউনিয়ন বোর্ড ও কোর্ট পিকেটিং সর্বপ্রথম পাইকপাড়ার নারীগণ আরম্ভ করেন। পাইকপাড়ার কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বিরজাবসু ও কিরণ বালা রুদ্রের নেতৃত্বে টঙ্গিবাড়ী থানার আবদুল্লাহপুর ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে প্রথম পিকেটিং শুরু হয়।[৪৬] তাদের পিকেটিঙের ফলে বোর্ড সদস্যগণ অফিস ঘরে ঢুকতে ব্যর্থ হন। ফলে সেখানে বিচার কার্য ব্যাহত হয়। এমতাবস্থায় পাইকপাড়ার প্রেসিডেন্ট ও মেম্বারগণ পদত্যাগ করলে কোর্ট বন্ধ হয়ে যায়। এবং অনেক অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যরা পদত্যাগ করেন। ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন ও চৌকিদারী খাজনা বন্ধের আন্দোলনে বিক্রমপুরের আরও যে সকল নারী নিযুক্ত ছিলেন তারা হলেন মালখাঁনগরের লাবণ্য প্রভা গুহ, বিধুমূখী সেন, প্রফুল্লময়ী বসু, মৃণালিনী গুহ, স্বর্ণময়ী বসু , নীহার বসু, লতিকা বসু, রাইপুরার বিরজা বসু, কুমারী বাদলপ্রভা ধর, নলিনী দেবী সন্ধ্যা বসু, প্রফুল্লবালা বসু; তাজপুর, রসুনিয়া, আবীরপাড়ার কিরণশশী নন্দী, নিকুঞ্জবালা নন্দী, কিরণবালা কুন্ডু সরোজনী দে সরকার, উত্তমাসুন্দরী মজুমদার, রাধারাণী পাল, অমিয় সরকার, পারুল সরকার; বাহেরকের

কিরণবালা দেবী, সুরমা দেবী; কামারখাড়ার বিনোদিনী বসু, মনতোষিনী ঘোষ, কুসুমকুমারী ঘোষ; যশোলত্তের বিজনপ্রভা দেবী, উমাল্মী দেবী; হলদিয়ার সরযূবালা দেবী, ক্ষীরোদাসুন্দরী রায়, স্নেহলতা রায়, ননীবালা পাল, সুধাংশবালা সাহা, কুমারী চঞ্চল কুমারী চন্দ, রসযূবালা রক্ষিত, শান্তিময়ী দেবী, জ্যোতিরাণী দত্ত, পারুলবালা চন্দ, সুরবালা সাহা, জ্যোৎস্নালতা চন্দ, রেণুকাবালা মিত্র; শেখরনগরের হেনা দেবী প্রমুখ এবং নাম না জানা আরও অনেক গ্রাম্য নারী। এদের মধ্যে পরিণত বয়স্কা নারী যেমন ছিলেন তেমনি বালিকা স্বেচ্ছাসেবীগণও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালনের পর এরা যেভাবে নিষ্ঠার সাথে আইন অমান্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান তা পুরুষ সত্যাগ্রহীদেওও হতবুদ্ধি করে দেয়।[৪৭] ইউনিয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পদত্যাগ করানোর জন্য অনেক সময় এরা সকালে তাদের বাড়ীতে উপস্থিত হতেন, সারাদিন না খেয়ে নানা যুক্তি প্রদর্শন ও অনুরোধ ইত্যাদির মাধ্যমে বিকেলে তাদের পদত্যাগে রাজি করিয়ে তবে তারা বাড়ি ফিরতেন। কোর্টে পিকেটিংয়ের সময় নারীগণ বহু সংখ্যায় কোর্টের দ্বারদেশে বসে তকলিতে সূতা কাটতেন ও কর্মচারীদের সেখানে প্রবেশে বাঁধা দিতেন। এসময় মদ ও গাঁজার দোকানেও নারীগণ পিকেটিং করেছেন। চরকা ও খদ্দর প্রচলনেও বিক্রমপুরের নারীগণ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এক্ষেত্রে বাঘিরা, কামারখাড়া, নয়না প্রভৃতি গ্রামের নারীদের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাখিরাতে কাটুনীর সংখ্যা ৫০, কামারখাড়াতে ২৫ ও নয়নাতে ৭০। মূলত এসময় চরকা দ্বারা বস্ত্র শিল্পে গ্রামকে স্বাবলম্বী করাই তাদের মূল লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। বিক্রমপুরের নারী কর্মীদের সম্পর্কে জনৈক কংগ্রেসকর্মী বলেছিলেন - 'কি শোভাযাত্রা ও অর্থাদি সংগ্রহ, কি কোর্ট পিকেটিং, কি মেম্বরদের পদত্যাগ করানো, কংগ্রেসের সব কাজই, এঁদের কাজই বলা যায়। এঁরাতো সবটাতেই সর্বময়।'[৪৮] বাস্তবিক পক্ষেই তখনকার নারীগণ আন্দোলনের শুরু থেকেই সত্যাগ্রহীদের জন্য টাকা, স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি দান হতে আরম্ভ করে শোভাযাত্রা, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দান ও চরকা প্রচলন, পিকেটিং ইত্যাদি প্রতিটি কাজে অংশগ্রহণ করেন এবং এসব কাজ সংগঠিতভাবে করার জন্য প্রতিটি গ্রামে অনেক নারী সমিতি গড়ে ওঠে। এসব সমিতিকে একত্রিত করে ১৯৩১ সালে আশালতা সেন 'বিক্রমপুর রাষ্ট্রীয় মহিলা সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। ১৯৩১ সালে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জেলা কংগ্রেস কমিটির সাথে একযোগে এই সমিতির নেতৃত্বে বিক্রমপুরের নারীগণ তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যান।[৪৯]

রাজনীতিতে বিক্রমপুরের নারীদের উপর্যুক্তরূপে আত্মপ্রকাশে সরকার যে যথেষ্ট বিচলিত হয়েছিল তা স্পষ্টতই বোঝা যায় এ এঞ্চলের নারীদের উপর শুরু হওয়া পুলিশি নির্যাতন থেকে। ১৯৩২ সালের ২৮ জানুয়ারি হলদিয়া গ্রামে বেআইনী সভা করার অপরাধে সরযূবালা দেবী ও স্নেহলতা রায়কে ৬ মাসের কারাদন্ড দেয়া হয়। ১৯৩২ সালের ৭ফেব্রুয়ারি মুন্সিগঞ্জ আদালত তাদের এই দন্ডাদেশ প্রদান করে। বেজগাঁ ইউনিয়ন বোর্ড পিকেটিং করার অপরাধে উষাবালা চন্দ ও চপলাসুন্দরী ধুপীকে, মালখানগর ইউনিয়ন বোর্ডে পিকেটিং করার জন্য বিধুমূখী সোম, লাবণ্য মুখুটি, সরযূবালা ঘোষ, সুখলতা চক্রবর্তী, লাবণ্য দাসগুপ্ত, মানদাসুন্দরী চক্রবর্তী ও পার্বতীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী পুলিশ আবদুল্লাহপুর ইউনিয়ন বোর্ডে পিকেটিং করার অফিযোগে এক দল ছোট ছোট বালিকাকে গ্রেপ্তার করে তিন মাইল দূরে রামপালে নিয়ে যায় এবং বিকেল পর্যন্ত আটকে রাখে। ২১ ফেব্রুয়ারী কাইচাল ও আউটশাহী ইউনিয়ন বোর্ড পিকেটিং করার অভিযোগে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যাপ্রসাদ সেন স্বয়ং ১২ জন নারীকে গ্রেফতার করেন। অবশ্য বিকেলেই তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। এ সময়ে সিরাজদীঘার মাদক দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং করায় তেরোজন নারীকে গ্রেফতার করা হয়। এভাবে ১৯৩২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বিক্রমপুরের বহু নারীকে গ্রেফতার করা হয়। এঁদের মধ্যে দণ্ড দেয়া হয় ১৪ জনকে।[৫০] এসময় আদালত কিরণবালা কুশারী ও বিরজাবালা বসুসহ ৫০ জন স্ত্রী পুরুষ কয়েদীকে মুন্সীগঞ্জ সাব জেল হতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করে।[৫১]

এই দন্ডাদেশ নারী সত্যাগ্রহীদের কিছুমাত্র বিচলিত করেনি। পরবর্তী এক মাসেই দন্ডপ্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যায় ১৯৩২ সালের ১১মার্চ পর্যন্ত ৪৫ জন নারী দন্ডিত হয়েছেন এবং আরও পাঁচ জন বিচারাধীন রয়েছেন[৫২] সাজা দিয়েও যে নারীদের নিবৃত্ত করা যায়নি সরযুবালা দেবীর কর্মতৎপরতা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। দু'মাস সাজা ভোগ করে মুক্তিলাভের পর পরই তিনি পুনরায় আন্দোলনে যোগ দান করেন। ১১ সেপ্টেম্বর শ্রীনগর থানায় অনুষ্ঠিত এক সভায় যোগদানের অভিযোগে তিনি পুনরায় ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৩ ধারা অনুযায়ী ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন। এসময় তাঁর সাথে প্রফুল্লবালা কুন্ডুসহ বেশ ক'জন কংগ্রেস সত্যগ্রহীও দন্ডিত হন। সেপ্টেম্বর মাস থেকে আরও অনেক সত্যাগ্রহী দমননীতির শিকার হন। এদের মধ্যে রয়েছেন বেআইনী ঘোষিত পাইকপাড়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য হিরন্ময়ী ঘোষ। একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করার অপরাধে আরও ৯জন নারীসহ তাঁকে রাস্তায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাদের হাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। মালখাঁনগর ইউনিয়ন কোর্টের সামনে পিকেটিং করায় তরুবালা পালকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদন্ড ও একই সময়ে গ্রেফতারকৃত সারদাসুন্দরী দে'র প্রতি আদালতের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক থাকার আদেশ দেওয়া হয়।

মুন্সিগঞ্জে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিসহ শোভাযাত্রা পরিচালনা করার অপরাধে বেআইনী ঘোষিত তালতলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য সুরবালা সেন ও অপর চারজন নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবশ্য কিছুক্ষণ পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হলেও একই ভাবে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে শোভাযাত্রা বের করার অপরাধে ১৯সেপ্টেম্বর বেআইনী ঘোষিত পাইকপাড়া কংগ্রেস কমিটির পরিচালক উত্তমাসুন্দরী মজুমদার ১৪৩ ধারা অনুযায়ী ৬ মাস ও হিরন্ময়ী ঘোষ ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডিত হন। আরও পাঁচজন নারীকে কোর্টের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখা হয়। এদের মধ্যে দু'জনকে বার্ধক্যে কারণে ছেড়ে দেওয়া হলেও হেনা মজুমদার, চপলাসুন্দরী দেবী ও অপর একজনকে বিচার সাপেক্ষে হাজতে রাখা হয়। একই দিন তালতলা ইউনিয়ন বোর্ডে পিকেটিং করার অপরাধে দু'জন নারী অভিযুক্ত হন। তাদের সমস্ত দিন তালতলা পুলিশ ক্যাম্পে বসিয়ে রেখে সন্ধ্যায় ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তালতলা কংগ্রেস কমিটির পাঁচজন নারী দস্য কংগ্রেস পতাকা নিয়ে বন্দেমাতরম ধ্বনিসহ শোভাযাত্রা বের করার অপরাধে গ্রেপ্তার হন। সেপ্টেম্বর মাসে বিক্রমপুরে গ্রেফতারকৃত নারীদের মধ্যে আরও ছিলেন আশালতা দেবী এবং সর্বসুন্দরী পাল। এরা ৬ সেপ্টেম্বর মুন্সিগঞ্জে কংগ্রেসের শোভাযাত্রা পরিচালনা করার অপরাধে গ্রেফতার হয়েছিলেন। বিচার শেষে তাদের ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয় এবং ধৃত অপর ৩জনকে আদালতের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখার আদেশ দেওয়া হয়। একই দিন অপর একটি শোভাযাত্রা পরিচালিত করার অভিযোগে সুহাসিনী দে ও ফুলবাহার বিবি ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন। বিক্রমপুরের মুসলমান নারীদের মধ্যে ফুলবাহার বিবি ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন। বিক্রমপুরের মুসলমান নারীদের মধ্যে ফুলবাহার বিবি ছিলেন প্রথম প্রথম কারাদন্ডপ্রাপ্ত।[৫৩] পরবর্তী মাসগুলিতেও নারীদের গেফতার ও কারাদন্ড প্রদান অব্যাহত থাকে। ১৩ নভেম্বর কুসুমহাটী ইউনিয়ন কোর্টে পিকেটিং করার অপরাধে পুলিশ সুনীতিবালা কর, হেমলতা আচার্য্য ও সেখ সাধুকে গ্রেপ্তার করে। ১৫ নভেম্বর বিচারে নারীদের প্রত্যেককে ৩মাস ও শেখ সাধুকে ৬ মাস সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। নারীদের বহরমপুর জেলে পাঠানো হয়। এ সময় সুনীতিবালা করের সাথে তাঁর শিশুকন্যাও জেলে অবস্থান করে। একই সঙ্গে আবদুল্লাহপুর ইউনিয়ন কোর্টে পিকেটিং করার অপরাধে পাইকপাড়ার চপলাসুন্দরী দেবী ও ইন্দুমতী মিত্রকে ৬৭ ধারায় ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। পরে এঁদের মুন্সিগঞ্জ থেকে ঢাকা জেলে স্থানান্তর করা হয়।[৫৪] শুধু পিকেটিং নয় পুলিশের দখল থেকে বাহেরক সত্যাশ্রম দখল করতে গিয়েও নারী সত্যাগ্রহীরা কারারুদ্ধ হন। এ সময় সুরমা মুখার্জী ৬ মাস, কুসুমকুমারী দেবী ৪ মাস এবং সুরুচি দেবী ৩ মাস সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন। সুকুমারী দত্ত ও প্রভালক্ষ্মী দেবীকে কোর্টের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখা হয়।[৫৫] ১৯৩২

সালের শেষ ভাগে আব্দুল্লাহপুর পাইকপাড়া ইউনিয়ন কোর্টের সামনে পিকেটিং করার জন্য বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৬৭ ধারায় মাখনবালা সরকারকে ৪ মাসের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয় এবং কিরণ বালা দে কে কোর্টের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখা হয়।[৫৬] মুন্সিগঞ্জে কংগ্রেস শোভাযাত্রা পরিচালনা করা হয়। তবে তাদের সতর্ক করেই ছেড়ে দেওয়া হয়।[৫৭] ১৯৩৩ সালে সালের ২৬ জানুয়ারী নশঙ্কর নারী শিবিরের সরোজিনী দে, স্নেহলতা নাগ, পারুলবালা দত্ত, সুকুমারী দত্ত ও বাহেরক সত্যাশ্রমের সুনীলচন্দ্র দাস মুন্সীগঞ্জে প্রভাত ফেরী বের করলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে।[৫৮] ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে গান্ধীজী কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করার পূর্ব পর্যন্ত বিক্রমপুরের নারী সত্যাগ্রহীদের আন্দোলন, গ্রেপ্তার ও কারাবরণ অব্যাহত থাকে।

শুধু হরতাল পিকেটিং কিংবা খাদির প্রচলনেই নয় কংগ্রেসের প্রতিটি কার্যসূচীতেই বিক্রমপুরের নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। তাঁরা 'স্বাধীনতা দিবস'-এর কর্মসূচিও উদযাপন করে। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে এ দিবস পালন উপলক্ষ্যে বারো জন নারী অভিযুক্ত হন। তাদের মধ্যে পাঁচ জনকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড, একজনকে বিনাশ্রম কারাদন্ড ও বাকী ছয়জনকে কোর্টের কাজ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখা হয়।[৫৯] একইভাবে পাইকপাড়ার নারীগণ 'ডান্ডি দিবস' পালনের জন্য ১৯৩২ সালের ১২ মার্চ এক শোভাযাত্রা বের করেন। শোভাযাত্রাটি পাইকপাড়া স্কুল হতে বের হয়ে পাইকপাড়া পরিভ্রমণ শে,ে আব্দুল্লাহপুরে প্রবেশ করে। সেখানে কানাইচঙ-এর মাঠে এক সভার আয়োজন করা হয়। পুলিশ সভাস্থল থেকে কিরণবালা রুদ্র, তাঁর ৯ বছরের কন্যা কুমারী জ্যোৎস্নারুদ্র, ছায়া রায়, উত্তমাসুন্দরী মজুমদার, জগত্তারিণী দেবী, কামিনীসুন্দরী দেবী, কুমারী হেনা মজুমদার সহ কয়েকজন পুরুষ সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে। সেখানে থেকে টঙ্গীবাড়ী থানায় নিয়ে যাবার সময় জগত্তারিনী দেবী ও কামিণী সুন্দরী দেবীকে পুলিশ ছেড়ে দেয়।[৬০]

বিক্রমপুরের নারীগণ যে আন্তরিকতা নিয়ে আন্দোলনে যোগদান করেন তা বিস্ময়কর। ১৯৩২ সালে ১১ জানুয়ারী হতে ১৯৩৩ সালের ১৪ জানুয়ারী পর্যন্ত বিক্রমপুরের মোট ৭৫৬ জনকে আইন অমান্য করার অপরাধে দন্ড দেওয়া হয়। এদের মধ্যে ২৭৭ জনের মধ্যে২ জনকে ১৫ মাস, ২জনকে ১ বৎসর, ৫ জনকে ৯ মাস, ৫১জনকে ৬ মাস, ৩জনকে ৩মাস, ২২ জনকে ৩মাসের কম এবং ১৭০ জনকে কোর্টের কাজ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট ৩জনকে সতর্ক করা হয়। ৬ জন ৫৬২ ধারায় মুক্তি লাভ করেন। এছাড়া ২১ জন পূর্ণ বয়স্ক নারীকে ৪৩৪ টাকা এবং ১৬ বছরের কম বয়সের ৬ জন বালিকাকে ১১৫ টাকা জরিমানা করা হয়। দন্ডিত সকলকেই জেলে 'সি' শ্রেণীতে রাখা হয়। ২২ জনকে বিনাশ্রম এবং অবশিষ্ট সকলকে সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়।[৬১]

বিক্রমপুরের মত ঢাকার নবাবগঞ্জের নারীগণও আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ঢাকা প্রকাশের একটি খবরে দেখা যায় ১৯৩২ সালে আইন অমান্যের অজুহাতে নবাবগঞ্জের ৬৯ জন নারীকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে ৯ জনকে কারাদন্ড দেয়া হয় এবং অন্যান্যদের জরিমানার বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।[৬২]

**৫**

আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনও অব্যাহত ছিল। এ আন্দোলনের বৈপ্লবিক কর্ম তৎপরতার সাথেও ঢাকার নারীদের সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা যায়। ইতঃপূর্বে এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন সোনারগাঁয়ের অনুশীলন দলের নরেন্দ্র মোহন সেনের মা জগৎতারা সেন, সূত্রাপুরের প্রতুল গাঙ্গুলীর মা বগলাসুন্দরী দেবী, বিক্রমপুরের বিন্দুবাসিনী সোম, ব্রহ্মময়ী সেন, চিন্ময়ী সেন প্রমুখ। এরা পলাতক বিপ্লবীদের খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতেন তাদের অস্ত্র ও গোপন লিফলেট লুকিয়ে রাখতেন এবং প্রয়োজনে অন্যান্য বিপ্লবীদের কাছে সেগুলো

পৌঁছে দিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের অবসানে বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিসমাপ্তি না ঘটে বরঞ্চ আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯১৫ সালের ইন্দো- জার্মান ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেলে পুলিশি ধরপাকড়ের মুখে ঢাকা সদরের বগলা সুন্দরী দেবী এবং বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের বিন্দুবাসিনী সোম বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রী হিসেবে আবির্ভূত হন। এ সময় বিপ্লবী নিশিকান্ত পাইনের মা দুর্গামণি পাইন বিপ্লবীদের আশ্রয় দান করে পুলিশি নির্যাতনের সম্মুখীন হন। তাঁকে গৃহে অন্তরীন রাখা হয়েছিল।[৬৩] পুলিশি তৎপরতা থেকে এ কালপর্বে ঢাকার আরও দু'একজন নারী বিপ্লবী তৎপরতার সাথে যুক্ত ছিলেন বলে অনুমিত হয়। এমন একজন ছিলেন ফ্লোরেন মজুমদার। ১৯১৪ সালে সি আইডি পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।[৬৪] কিন্তু তাঁর কাজের ধরণ বা কাদের সাথে তিনি কাজ করতেন সে সম্পর্কে কোনতত্যই এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিপ্লবী কর্মতৎপরতা সাময়িক কালের জন্য স্থগিত হয়। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর বাংলায় বিপ্লবীগণ পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯২২ ও ১৯২৩ সালে ঢাকার দু'জন নারীর কথা জানা যায়। পলাতক বিপ্লবীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার কাজে তাঁরা নিয়োজিত ছিলেন। এঁদের একজন ছিলেন বিক্রমপুরের রাউৎভোগ গ্রামের স্নেহলতা বসু। অন্যজন ফরিদপুরের পালং থানার অম্বিকা দেবী।[৬৫] ত্রিশের দশকের গোড়ায় বিপ্লবী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠলে অসংখ্য নারী এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত হন। প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কাজে যোগদানকারী প্রথম নারী হলেন লীলা নাগ। সিলেটের অধিবাসী হলেও ঢাকাকে কেন্দ্র করেই তাঁর কর্মজীবনের বিকাশ ঘটে। উচ্চ পদস্থ পিতার উচ্চশিক্ষিতা কন্যা নারী সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের ব্রত নিয়ে ১৯২৩ সালে 'দীপালী সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। একই সাথে তিনি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে নিজ দেশ ও জাতিকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেন। এ ব্যাপারে জাতীয় বিপ্লবীদের অনুসৃত পথই তাঁর কাছে কার্যকর বিবেচিত হয়। ইতোমধ্যে প্রাক্তন সহপাঠী অনিল রায়ের মাধ্যমে বিপ্লবী দল" শ্রী সংঘের" সাথে তাঁর যোগাযোগ ঘটে এবং ১৯২৫ সালে তিনি এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন। লীলা নাগই প্রথম বাঙালী নারী যিনি বিপ্লবী দলের সদস্যপদ লাভ করেন। শুধু সদস্য নয় শ্রীসংঘের প্রতিষ্ঠাতা অনিল রায়ের সহযোগী হিসেবে তিনি নেতৃত্বস্থানীয়দের মাঝে জায়গা করে নেন।[৬৬] বিপ্লবী দলে নারীদের অন্তর্ভূক্ত না করার পূর্বের রীতি তখনও চালু থাকায় লীলা নাগের বিপ্লবী দলে যোগদান শ্রী সংঘের চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তার উপর নেতৃত্ব দানকারী পর্যায়ের তাঁর অবস্থান বিপ্লবীদের অনেকেই মনঃপুত হয়নি। কারণ বৈপ্লবিক চেতনার অধিকারী হলেও সে সময় বিপ্লবীরা তাদের চিরন্তন সংস্কার নারীর অধঃস্তন ভূমিকাকেই শাশ্বত মনে করত। ফলে লীলা নাগের নেতৃত্ব দলটিকে ভাঙনের মুখে নিয়ে আসে। একই সাথে শ্রী সংঘের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায় লীলা নাগের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত দলটিকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়।[৬৭] ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে দলের একাংশ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা বিভি নামে নতুন দল গঠনের মাধ্যমে শ্রী সংঘ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে শ্রীসংঘকে পুনর্গঠিত করার দায়িত্ব এসে পড়ে লীলা নাগ ও অনিল রায়ের উপর। অবশ্য এর আগে ১৯২৮ সাল থেকে অনিল রায় ও লীলা নাগ শ্রীসংঘের শাখা বিস্তারের জন্য বাংলা, আসাম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ সময় শিলচর, শিলং, গৌহাটি, আগরতলা, সিলেট, কুমিল্লা, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দলের শক্তিশালী ঘাটি গড়ে ওঠে।[৬৮] একদিকে দলের বিভাজন ও অন্যদিকে ১৯৩০ সালের ১৮এপ্রিল চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর অনিল রায়ের গ্রেপ্তার শ্রী সংঘকে সংকটে ফেলে দেয়। এ কঠিন সময়ে দলের প্রধান হিসেবে শ্রীসংঘকে পুণর্গঠিত ও পরিচালিত করতে লীলা নাগ সাফল্যের পরিচয় দেন। তিনি প্রথমেই দলের সকল সদস্যের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটান।[৬৯] একই সাথে তিনি বিপ্লবী কাজের জন্য মেয়েদের সংগঠিত করার কর্মসূচী

হাতে নেন। ১৯২৬ সালে তিনি নিজে ছাত্রীসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সময় এটি তাঁর বিপ্লবী কর্মপ্রয়াসের সহযোগী হয়ে ওঠে। ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে দিপালী সংঘ-ছাত্রীসংঘের যোগাযোগে ঢাকার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মেয়ে লীলা নাগের নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। শ্রীসংঘের পরিচালনায় লীলা নাগের দক্ষতা অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলোকে নারীদের সদস্য না করার কঠিন প্রত্যয় থেকে সরিয়ে আনে। ফলে শ্রীসংঘসহ অন্যান্য বিপ্লবী দলে নারীদের সদস্য করার নীতি গৃহীত হয়। এ সময় ঢাকার শ্রীসংঘে সক্রিয় হন রেনু সেন, শকুন্তলা দেবী, নির্মলা ঘোষ,[৭০] বিভাবতী সেন, উষা রায়, সুরমা দাস, বীনা রায়, বকুল দত্ত, সুশীলা দাসগুপ্ত, প্রমীলাগুপ্ত, লাবণ্য দাসগুপ্ত, অশ্রুকণা সেন, হেলেনা দত্ত, রেণুকণা সেনগুপ্ত, অনুপমা বসু, করুণা কণা গুপ্ত, সুশীলা ঘোষ, লতিকা দাস, ললনা লাহা, রেণুকনা দত্ত, ঝুনু বসু অশোকা গুহ, লীলা সেন, কুমুদিনী সিংহ, গীতা সেন, পারুল গুপ্ত, কনক দত্ত, জ্যোৎস্না সেন, আশা রায়, রাধা রায়, আশালতা দাশগুপ্ত, শান্তি দাসগুপ্ত, হেলেনা বসু, নীলিমা বসু, প্রভা দে, স্বপ্না চৌধুরী, হেমাঙ্গিনী ঘোষ, শৈলবালা বসু প্রমুখ।[৭১] এদের মধ্যে রেনু সেন এবং লাবণ্য দাশগুপ্ত লীলা নাগের সাতে শ্রীসংঘের সাংগঠনিক কাজে যুক্ত ছিলেন। এরা তরুনীদের দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং তাদের বিপ্লবী দল শ্রীসংঘের গোয দিতে সাহস যোগাতেন। একই সাথে সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহেও লীলা নাগ সক্রিয় হন। অনিল রায় ও লীলা নাগ অস্ত্র কেনার চেয়ে নিজস্বভাবে উৎপাদনের কথা ভেবেছিলেন এবং সে অনুযায়ী কোলকাতা থেকে বোমার খোল সংগ্রহ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের কৃতী ছাত্র শ্রীসংঘ ক্ষী অনুল দাস বোমা বানানোর উদ্যোগ নেন। বিপ্লবী দলগুলোর সঙ্গে ফর্মুলা অনুযায়ী বোমা বানানোর প্রস্তাব নিয়ে আলাপ- আলোচনার সাথে সাথে কোলকাতা থেকে বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করতে লীলা নাগ ঢাকা ও কোলকাতায় ব্যাপক সফর করেন।[৭২] তাঁর এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছেন রেনু সেন, নৃপেন চক্রবর্তী, অমল রায়, কুমুদিনী, ইন্দুমতী সিংহ প্রমুখ। কুমুদিনী সিংহের বাসভবন থেকে বিভিন্ন স্থানে অস্ত্র সরবরাহ করা হতো। ঢাকার অস্ত্রগুলো ছিল বক্সীবাজার, ওয়ারী, ঠাটারিবাজার, গেন্ডারিয়া, বাংলা বাজার, লক্ষ্মীবাজার, ফরাশগঞ্জ, সিদ্ধেশ্বরী, তাঁতিবাজার, কায়েতটুলী, চাঁদনিঘাট, আজিমপুর ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো। অস্ত্র লুকিয়ে রাখা ও যথাস্থানে পৌছে দেয়ার কঠিন দায়িত্ব পালন করেন রুনু বসু, হেলেনা দত্ত, রেণুকণা সেনগুপ্ত, লতিকা দাস, অনুপমা বসু , রেণুকণা দত্ত প্রমুখ। অন্যান্য বিপ্লবী দলের কর্মীরাও অর্থ ও অস্ত্রের জন্য লীলা নাগের দ্বারস্থ হতেন।[৭৩]

এসময় ঢাকার আরও যেসব নারী অন্যান্য বিপ্লবী দলে যোগ দেন তাদের মধ্যে চিলেন মীরা দত্তগুপ্ত। তিনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলে যোগ দেন এবং সে দলের মুখপত্র 'বেণু'র মহিলা বিভাগটি সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঐ পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের উদ্যোগ নেন। বাংলার তরুণ-তরণীদের তিনি বিদেশী শাসকদের বিরুদ্দে সাহসী ও শক্তি সঞ্চয় করার আহ্বান জানান। তরুণদের মাঝে বেণুর প্রভাব ছিল অপরিসীম।[৭৪] ঢাকার আরেক বিপ্লবী নারী উজ্জ্বলা মজুমদার ১৯৩৩ সালে দার্জিলিং -এ গভর্ণর এণ্ডারসনকে গুলি করার অপরাধে প্রথম দীপান্তর ও পরে যাবজ্জীবন কারাদন্ড লাভ করেন।[৭৫] প্রখ্যাত বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ঢাকার অধিবাসী না হলেও তার বৈপ্লবিক চেতনার স্ফুরণ ঘটেছিল দীপালী সংঘের কার্যাবলীর সাথে যুক্ত হয়ে। ইডেন কলেজে পড়ার সময় তিনি ঐ সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করেন এবং লীলা নাগের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে নারী মুক্তি সাথে সাথে তাঁর বিপ্লবী চেতনাকেও শানিত করে তোলেন।

বস্তুতঃ ১৯৩০-৩১ সালে সংগঠিত অধিকাংশ বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের নেপথ্যে ছিলেন লীলা নাগ। কিন্তু ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা স্কুলের দু'জন ছাত্রী শান্তি ও সুনীতি সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করলে পুলিশ যাবতীয় সন্দেহভাজন বিপ্লবীদের গ্রেফতার করা শুরু করে। ইতোপূর্বে পুলিশ বিপ্লবী কাজে নারীদের সংশ্লিষ্টতার

বিষয়টি অবগত থাকলেও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে তাদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি। কিন্তু কুমিল্লার ঘটনার পর তারা সন্দেহভাজন বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করার কর্মসূচী হাতে নেয়। প্রথম সুযোগেই তারা লীলা নাগকে গ্রেপ্তার করে বিদ্রোহের মূলোৎপাটনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে লীলা নাগের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ না থাকায় তাকে কোনরূপ বিচারে সোপর্দ করা যায়নি। ফলে দীর্ঘ ৬ বছর তাঁকে বিনা বিচারেই কারাবরণ করতে হয়।[৭৬] এসময় লীলা নাগের ঘনিষ্ঠ সহযোগী রেণুকা রায়ও ঢাকায় বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে কারারুদ্ধ হন।[৭৭] লীলা নাগের কারাবরণের পর ঢাকায় বৈপ্লবিক তৎপরতা কমে আসলেও একবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। তাই ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বিপ্লবীদের পিছনে পুলিশের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে ঢাকায় আরো ক'জন বিপ্লবী নারী কারারুদ্ধ হন। এরা হলেন লাবণ্যপ্রভা দাসগুপ্তা, মায়ারাণী নাগ, সুরমা দাস, প্রেমসাধনা রায়, বেনু সেন, আশালতা সেন, পারুলবালা মুখোপাধ্যায়, হেলেন বল প্রমুখ।[৭৮] বস্তুতঃ এরপর পুরো বাংলায়ই বৈপ্লবিক আন্দোলনের তৎপরতা কমে আসতে থাকে এবং ১৯৩৮ সালে বৈপ্লবিক দলগুলির বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে বাংলায় এ আন্দোলনের অবসান ঘটে।

৬

১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত হবার পর থেকে ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন নারীদের রাজনৈতিক আন্দোলন কার্যত গতিবেগ হারায়। বস্তুত এ কালপর্বে কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসনবিরোধী গণ আন্দোলন গড়ে তোলার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।[৭৯] ফলে রাজনৈতিক কোন কর্মসূচি না থাকায় আলোচ্য কালপর্বে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ নারী কর্মীগণ গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পূর্বের মতই বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে নেতৃবর্গ চরকা, তাঁত, খদ্দর ইত্যাদি প্রচলনের লক্ষে গণসংযোগে বের হন। ঢাকাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ঢাকার আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র বিক্রমপুরে ১৯৩৭ সালে গঠনমূলক কাজের সূচনা হয়। ৫মে হুগলীর কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লকুমার সেনের সভাপতিত্বে ঢাকা জেলার বিশিষ্ট পুরুষ ও নারী কর্মীগণের উপস্থিতিতে আউটশাহী গঠনমূলক কর্ম কেন্দ্রের নতুন গৃহপ্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।[৮০] এর পর পরই ঢাকা থেকে নারী কর্মীগণ নারীদের মধ্যে প্রচার কার্য চালাতে বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রাম সফর করেন। সেপ্টেম্বর মাসে সরমাগুপ্তা ও আশালতা সেন বিক্রমপুর আসেন। তাঁরা পাইকপাড়ার কিরণবালা রুদ্র, প্রসন্নময়ী দেবী ও সুহাসিনী দাসের সাথে ৪ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাইকপাড়া, নাটেশ্বর, সোনারঙ্গ, জোড়াদেউল, নশঙ্কর, আউটশাহী ও মালখাঁনগর প্রভৃতি গ্রাম পরিভ্রমণ করে সঙ্ঘের সভ্য সংগ্রহ করেন ও তাঁদের বক্তব্য প্রচার করেন। তবে এ সময় নারীরা যে সমকালীন রাজনীতি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এমন নয়। তাই দেখা যায় ৪সেপ্টেম্বর পাইক পাড়ায় ও ৭ সেপ্টেম্বর নশঙ্করে অনুষ্ঠিত দু'টি নারী সভায় আন্দামানের বন্দীদের অতিদ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের ও অন্য রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৮১]

উল্লেখ্য যে ১৯৩৭ সাল নাগাদ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি একটি গণ দাবিতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসের শেষ থেকে সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি এবং আন্দামান সেলুলার জেলে আটক বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে ব্যাপক গণ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পুরুষদের সাথে সাথে নানা মতের, নানা দলের মেয়েরা এ আন্দোলনে সমবেত হন। বিশেষ করে ছাত্রী সমাজ ক্রমশ বেশী সংখ্যায় এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। মূলত ১৯৩৬ সালে ছাত্র ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ধীরে ধীরে রাজনীতির প্রতি ছাত্রীদের আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। ১৯৩৭-৩৮ সালে বন্দীমুক্তি আন্দোলনের সময় অনুষ্ঠিত বড় বড় সভা ও মিছিলে তারা যোগ দিতে শুরু করে। এ আন্দোলনের চাপে ১৮ নভেম্বর বঙ্গীয় সরকার রাজবন্দীদের মুক্তি দেবার সিদ্ধআন্ত গ্রহণ করে। প্রতিবার ১০০ জন করে এক মাসের মধ্যে দশবারের সরকার বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেন।[৮২] নভেম্বর মাসেই প্রথম তালিকার একশত

জন মুক্তি লাভ করে। এদের মধ্যে কোন নারী ছিলেন না। দ্বিতীয় তালিকায় ৫৪ নম্বর বন্দী হিসেবে সুহাসিনী গাঙ্গুলী মুক্তি লাভ করেন।[৮৩] এরপর চতুর্থ তালিকায় ৫নং বন্দী কল্যাণী দাস ও ৬ নং বন্দী বিমলপ্রতিভা দেবী মুক্তি পান। পঞ্চম তালিকায় ১৭নম্বর বন্দি কমলা চ্যাটার্জি, ৬ষ্ঠ তালিকায় ৫৩ নম্বর বন্দি হেলেনা বল ও ৫৪ নম্বর বন্দি কুমারী রেনু সেনগুপ্তা, সপ্তম তালিকায় ৭২ নম্বর বন্দি ইন্দুমতি সিংহ ও নবম তালিকায় ৪ নম্বর বন্দি লীলা নাগ মুক্তি লাভ করেন।[৮৪]

আলোচিত সময় পর্যন্ত বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন কংগ্রেসের অহিংস ও বিপ্লবীদের দ্বারা সহিংস পন্থায় পরিচালিত হলেও ত্রিশের দশকের মাঝামাঝিতে বিপ্লবীদের চিন্তাধারায় তাদের অনুসারিত পথ প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বস্তুত বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াসের ব্যর্থতা তাঁদের চিন্তা চেতনায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। বৈপ্লবিক পন্থার গণবিচ্ছিন্নতা স্বাধীনতা লাভের পথে যে বড় অন্তরায় এ বিশ্বাস ত্রিশের দশকের শেষ পর্যায়ে বিপ্লবপন্থার অবসান ঘটায়। ইতোমধ্যে অন্তরীণ অবস্থাতেই বিপ্লবীদের একাংশ কমিউনিজম মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অপর অংশ কংগ্রেসের গণভিত্তিকে পুঁজি করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসে যোগদান করে। লীলা নাগ ছিলেন এমতের অনুসারী। তাই মুক্তি লাভের পর পরই লীলা নাগ কংগ্রেসে যোগ দেন। দলমত নির্বিশেষে নারীদের নিয়ে একই মঞ্চ থেকে কাজ করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস মহিলা সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। মোহিনী দেবী এ সংঘের সভাপতি এবং লাবণ্য লতা চন্দ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৮৫] ক্রমান্বয়ে ঢাকাসহ অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেসের নারী শাখা গড়ে ওঠে। জেলে থাকা অবশিষ্ট রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে কংগ্রেস মহিলা সংঘ প্রথম জনমত তৈরীর প্রয়াস চালায়। ঢাকার আশালতা সেন ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সাল জুড়ে বিক্রমপুর, দিনাজপুর, বগুড়া রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, খুলনা, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলা ভ্রমণ করেন এবং স্থানীয় কর্মীদের সংগঠিত করার প্রয়াস নেন।[৮৬]

তবে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নারীদের উপযুক্ত কর্মপ্রয়াস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একদিকে সুভাষ চন্দ্র বসুর কংগ্রেস সভাপতিত্ব নিয়ে বিরোধ (১৯৩৯), তাঁর কংগ্ররেস ত্যাগ ও ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন অন্যদিকে কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার কার্য পরিচালনার জন্য গঠিত 'অ্যাড হক কমিটি' অন্যান্য অনেক কিছুর মত বাংলার নারী সমাজকে বিভক্ত করে দেয়। লীলা নাগ এসময় সুভাষ বসুর সাথে যোগ দেন এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের একজন শক্তিশালী নেতৃরূপে আবির্ভূত হন। তাই তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রধানত কলকাতা কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে ঢাকা কেন্দ্রিক নারী আন্দোলনের সাথে আগের মত তাঁর আর যোগাযোগ থাকে না। তাছাড়া অক্ষ শক্তির পক্ষে শক্তির পক্ষে যোগ দিয়ে সুভাষ বসু ভারত ত্যাগ করলে ফরোয়ার্ড ব্লক সরকারী রোষানলে পড়ে এবং এর অন্যতম নেত্রী লীলা নাগ পুনরায় কারারুদ্ধ হন।[৮৭] ১৯৪৬ সালে মুক্তি লাভ করলেও বিভাগপূর্ব ঢাকার রাজনীতিতে তিনি আর সক্রিয় হয়ে উঠেননি।

ইতোমধ্যে ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ঘোষণা দেয়। ভারত ছাড় প্রস্তাব গৃহীত হবার দিনই মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আজাদ, সরোজিনী নাইডু, জওহরলাল নেহেরু, সর্দার প্যাটেলসহ গুরুত্বপূর্ণ সব নেতা-নেত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথম থেকেই ব্রিটিশ সরকারের এই দমনমূলক নীতি জনগণকে আক্রমণমূখী সব নেতা-নেত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথম থেকেই ব্রিটিশ সরকারের এই দমনমূলক নীতি জনগণকে আক্রমণমুখী করে তোলে এবং সাধারণ কর্মী ও জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এ আন্দোলন তীব্র গতি লাভ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেকটা গণঅভ্যুত্থানের মত অবস্থা দেখা দেয়।[৮৮] বিশেষ করে ঢাকা, কোলকাতা, মেদিনীপুর, বীরভূম এবং সিলেট আন্দোলনের প্রভাবে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। নেতৃত্বহীন জনসাধারণের এই বিক্ষোভের প্রকাশ হয় ধ্বংসাত্বক কাজের ভিতর দিয়ে। ঢাকার কয়েকদিনব্যাপী হাজার হাজার জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষ চলতে থাকে। গেন্ডারিয়া রেলষ্টেশনসহ ঢাকা শহরের কাছারীগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ঢাকার প্রায় প্রত্যেকটি লাইটপোষ্ট ও টেলিগ্রাফ পোষ্ট

উপড়ে ফেলা হয়। নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমার প্রায় সমস্ত টেলিগ্রাফ পোষ্ট উপড়ে ফেলা হয়।[৮৯] জনগণের এই বিক্ষোভের জবাব পুলিশ বেশ নৃশংসতার সাথেই দেয়। একদিনেই পুলিশের গুলিতে ঢাকা শহরে সতের জন নিহত হয়।[৯০] পুলিশের এই চরম বর্বরতার মুখে আগস□আন্দোলনে ঢাকারা নারী সমাজকে সক্রিয় হতে দেখা যায় না। এ পর্যায়ে ঢাকার নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসনেত্রী আশালতা সেনসহ অন্যান্য কর্মীরা কমিউনিস□পার্টির নারী শাখা 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'তে যোগ দেন।[৯১] ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জাপানী বোমা হামলা এবং যুদ্ধজাত বিভিন্ন সংকটের হাত থেকে আত্মরক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে নারী সমাজকে মুক্তির পথে এগিয়ে নেওয়া জন্য প্রতিষ্ঠিত এ সমিতি প্রথম থেকেই দলমত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের নারীকে এ পার্টির অধীনে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। উদ্যোক্তাদের নিরলস প্রয়াসে এক বছরের মধ্যেই বাংলার ২৮টি জেলার মধ্যে ২১টি জেলায় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র তিনশতের বেশী শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২২ হাজারের বেশী নারী এ সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেন।[৯২] ঢাকা শহর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, চালাকচর ইত্যাদি অঞ্চলে সমিতির শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠে। এ পর্যায়ে আশালতা সেন ছাড়াও ঢাকায় যে সব নারী আত্মরক্ষা সমিতির কাজে তৎপর ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- নিরণবালা রায়, নিবেদিতা নাগ, অমিয় দত্ত, শিখা গুহ, ডলি বসু, নিবেদিতা ঘোষ, রাণী দাস, হাসি মুখার্জি, মৃণালিনী চক্রবর্তী প্রমুখ।[৯৩] বলা প্রয়োজন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হলেও আত্মরক্ষা সমিতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় সেবা ও সংস্কারমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিল। বিশেষ করে বাংলায় চরম খাদ্যাভাব দেখা দিলে এ সংগঠন নজিরবিহীন সেবা তৎপরতা চালায়। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আত্মরক্ষা সমিতি বাংলায় সংগঠিত প্রতিটি গণ আন্দোলনে যেমন যোগ দেয় তেমনি নারীর সামাজিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিটি দাবিতে থাকে সামনের সারিতে।[৯৪] তবে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে ঢাকায় আত্মরক্ষা সমিতির রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে কমই জানা যায়।

৭

উপযুক্ত আলোচনা থেকে আমরা লক্ষ করেছি অবরোধের ঘেরাটোপে বন্দী বাঙালি নারী ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ঘটনায় বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে রাজনীতিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। নানা কারণে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণিকে উত্তেজিত করেছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ করার দুর্ণিবার আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন আন্দোলন। এ আন্দোলনকে সফল করার লক্ষে তাঁরা স্বতপ্রণোদিত হযে বাঙালি নারীকে রাজনীতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালি নারী বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়। ঢাকার নারী সমাজও একই ধারাবাহিকতায় রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেয়। সমকালে ঢাকার মত মফঃস্বল শহরে রাজনীতির মত কথিত পুরুষালী কাজে নারীর অংশগ্রহণ স্বাভাবিক কোনো ঘটনা ছিল না। পর্দাপ্রথার বিলোপ কিংবা রাজনৈতিক সচেতনতা লাভের মত শিক্ষিত নারীর সংখ্যা ঢাকায় ছিল অল্প ক'জন। তবু এই নারীরাই বিদেশী বর্জন স্বদেশী ভান্ডারে অর্থদান ও অর্থ সংগ্রহ, বিপ্লবীদের সহায়তা করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অংশ নিতে এগিয়ে এসেছিলেন। বস্তুত পুরুষদের পক্ষ থেকে নারীদের সহায়তা কামনা নারীদের মাঝে এমন তীব্র আবেগের সঞ্চার করে যা তাদের চেনা জগতের বাইরে পা বাড়াতে সাহস যোগায়। দীর্ঘদিনের অবহেলা নারী মানসে যে হীনমন্যতা বোধের সৃষ্টি করেছিল রাজনৈতিক কাজে পুরুষের পাশে থেকে অংশগ্রহণ এর অবসান ঘটায়। প্রথম দিকে পুরুষদের আহ্বানে যোগ দিলেও ধীরে ধীরে নারীরাও দেশমাতার পরাধীনতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গ পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আগমন এবং নারীমুক্তি বিষয়ে তাঁর ভাবনা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারীকে কংগ্রেসমুখী করে তোলে। ফলে কংগ্রেসের প্রতিটি কর্মসূচিতে নারীরা স্বতস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। তাছাড়া শিক্ষার ক্রমবিস্তৃতকি

শিক্ষিত নারীদের আরও একটু বেশী সচেতন করে তোলে। তারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পরাধীনতার অবসান ঘটাতে চায় এবং সেজন্য সরকারী নির্যাতনকেও তারা নিঃশঙ্কচিত্তে বরণ করে নেয়। কাজেই বলা যায় ১৯৪৭ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন জোরদার হওয়ার পশ্চাতে ঢাকার নারীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ ভূমিকা রাজনৈতিক আন্দোলনকে সফল করার ক্ষেত্রেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না - একই সঙ্গে তা ঢাকা ও সংলগ্ন অঞ্চলের নারীদের অগ্রগতিতেও রেখেছিল অসামান্য অবদান।

**তথ্যসূত্র ও পাদটীকা ঃ**

১। হাকিম হ্যবিবুর রহমান (ডঃ মোহাম্মদ রেজাউল করিম অনুদিত), *'ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে (ঢাকা পাচাশ বারস্ পহেলে)*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০৫, পৃঃ ৭।

২। কেদারনাথ মজুমদার, এম.আর.এ. এস, *ঢাকার বিবরণ*, ইন্ডিয়ান পেট্রিয়ট প্রেস, কলকাতা, ১৯১০, পৃঃ ১০।

৩। এসব সভার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ কার্ত্তিক ১৩১২, পৃঃ ৩ ও ৫ ১১ অগ্রহায়ণ, ১৩১২, পৃঃ ৫, ১ বৈশাখ ১৩১৪ পৃঃ ৫, ১০ আষাঢ়, ১৩১৩ পৃঃ ৩ ও ৬, ও ১১ আষাঢ় ১৩১৩, পৃঃ ৫।

৪। *ঢাকা প্রকাশ*, ২৯ মাঘ ১৩১২, পৃঃ ৩, ১৯ কার্ত্তিক, ১৩১২, পৃঃ ৪ ও ১০আষাঢ়, ১৩১৩, পৃঃ৩।

৫। *ঢাকা প্রকাশ*, ১০ আষাঢ়,১৩১৩, পৃঃ ৩।

৬। *ঢাকা প্রকাশ*, ২৯ মাঘ, ১৩১২, পৃঃ ৩।

৭। ফরিদা আখতার সম্পাদিত, *শতবছরে বাংলাদেশের নারী*, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯১৯, পৃঃ ১৪।

৮। *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ কার্ত্তিক, ১৩১৩, পৃঃ ৫।

৯। আশালতা সেন, *সেকালের কথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ২০০৫, পৃঃ ১৪।

১০। ১৩১২ থেকে ১৩১৭ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত *'ভারত নারীর'* বিভিন্ন সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১। Bharati Roy, Swadeshi Movement and owmen's awakening in Bengal 1903-1910, *Calcutta Historical Journal*, Vol, IX, No. 2, 1985. pp. 284.

১২। *Ibid*, p. 84-85.

১৩। পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচির জন্য দ্রষ্টব্য, *ঢাকা প্রকাশ*, ১০ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯, পৃঃ ৫।

১৪। কৃষ্ণকলি বিশ্বাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চে ভারতের নারী*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ১০৯।

১৫। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ আশ্বিন, ১৩১৮, পৃঃ ৫। বাঙ্গালার কথা, ১২শ সংখ্যা, ১৩২৮, পৃঃ ৯৩।

১৬। *ঢাকা প্রকাশ*, ১০ মাঘ, ১৩২৭, পৃঃ৩।

১৭। *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ পৌষ, ১৩২৮, পৃঃ ৩।

১৮। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ মাঘ, ১৩২৮, পৃঃ ৩।

১৯। *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৯ মাঘ, ১৩২৮, পৃঃ ৩।

২০। *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ চৈত্র, ১৩২৮, পৃঃ ৪।

২১। পূর্ণ অভিভাষণটির জন্য দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯, পৃঃ ৪-৫।

২২। *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮বৈশাখ, ১৩৩০, পৃঃ ১।

২৩। *ঢাকা প্রকাশ*, ৪মাঘ, ১৩৩০, পৃঃ ১।

২৪। এসব সভার জন্য দ্রষ্টব্য : *ঢাকা প্রকাশ*, ৮জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ পৃঃ ৩,৪ চৈত্র ১৩২৯, পৃঃ ৩,৯ পৌষ, ১৩৩৪, পৃঃ ৩।

২৫। *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ চৈত্র, ১৩৩১, পৃঃ ৫ ।

২৬। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ আষাঢ়, ১৩৩৩, পৃঃ ৫ ও ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩, পৃঃ ৩।

২৭। আশালতা সেন, *সেকালের কথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫ ২য় সং (সন ১৯৯৬), পৃঃ ১৮।
২৮। শ্যামলী গুপ্ত (সম্পাঃ), *শতবর্ষের কৃতি বঙ্গ নারী*, ১৯০০-২০০০, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ৫৫।
২৯। আশালতা সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৮-১৯।
৩০। *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯-২০।
৩১। দীপালী সংঘের বিতারিত কার্যাবলীর জন্য দ্রষ্টব্য : দীপংকর মোহাত, *লীলা রায় ও বাংলার নারী জাগরণ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৩১-৩৫।
৩২। *জয়শ্রী*, ভাদ্র ১৩৭৫, পৃঃ ৭৫।
৩৩। *প্রবাসী*, কার্তিক, ১৩৩৫, পৃঃ ৩৫।
৩৪। দীপংকর মোহাত, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৩৫।
৩৫। *ঢাকা প্রকাশ*, ২৫ মাঘ, ১৩৩৪, পৃঃ ৩-৪।
৩৬। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ পৌষ, ১৩৩৭, পৃঃ ১।
৩৭। *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃঃ ১।
৩৮। ঢাকা প্রকাশ, ১৩ আষাঢ়, ১৩৩৮, পৃঃ ১।
৩৯। *ঢাকা প্রকাশ*, ১০ শ্রাবণ, ১৩৩৮, পৃঃ ১।
৪০। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ ফাগুণ, ১৩৩৮, পৃঃ১।
৪১। আশালতা সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২১।
৪২। *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১।
৪৩। *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১।
৪৪। *ঢাকা প্রকাশ*, ২৬ পৌশ, ১৩৩৭, পৃঃ১।
৪৫। বিক্রমপুরে নারী আন্দোলন, *জয়শ্রী*, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৩৮, সংযোযিত আশালতা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২-৪৮।
৪৬। *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৫। ঢাকা প্রকাশ, ৪ মাঘ ১৩৩৮, পৃঃ ১।
৪৭। আশালতা সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৫।
৪৮। *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৬।
৪৯। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ ফাগুন, ১৩৩৭, পৃঃ ১।
৫০। *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ ফাগুন, ১৩৩৮, পৃঃ১।
৫১। *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪মাঘ, ১৩৩৮, পৃঃ ১।
৫২। *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ চৈত্র, ১৩৩২, পৃঃ ১।
৫৩। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ আশ্বিন, ১৩৩৮, পৃঃ ৬।
৫৪। *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ ও ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮, পৃঃ ৩ ও ৫।
৫৫। *ঢাকা প্রকাশ*, ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮, পৃঃ ৩।
৫৬। *ঢাকা প্রকাশ*, ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮, পৃঃ ৩।
৫৭। *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ পৌষ, ১৩৩৮, পৃঃ৩।
৫৮। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ মাঘ, ১৩৩৯, পৃঃ ৫।
৫৯। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৪ ফাল্গুন, ১৩৩৯, পৃঃ৫।
৬০। *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ চৈত্র, ১৩৩৯, পৃঃ ৫।
৬১। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ মাঘ, ১৩৩৯, পৃঃ ৫।
৬২। *ঢাকা প্রকাশ*, ২মাঘ, ১৩৩৯, পৃঃ৫।

৬৩। গৌতম নিয়োগী, "জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলার নারী সমাজ", গৌতম-চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *ইতিহাস অনুসন্ধান-৪* কেপিবাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ৩২৮-৩২৯।

৬৪। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ মাঘ, ১৩২৬, ৪।

৬৫। Tirtha Mandal, The Women Revolutionaries of Bengal 1905-1939, Minerva, Calcutta, 1991, p. 55.

৬৬। দীপংকর মোহাত, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৪৬।

৬৭। নীলা নাগ বিপ্লবী দলগুলোর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সমর্থন করতেন না, তিনি চাইতেন সত্যিকারের বিপ্লব, তাছাড়া লীলা নাগ বিপ্লবী দলের গণবিচ্ছিন্ন তার কুফল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ফলে গণসম্প্রীতি প্রসারে তিনি কর্মীদের আহ্বান জানান। অনিল রায়ের সমর্থন পেলেও তাঁর এসব কার্যাবলী অনেককেই তার প্রতি বিরূপ করে তোলে। সূত্রঃ দীপকংর মোহাত, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৪৬-৪৭। অবশ্য বিপ্লবী দলগুলোর এটাই ছিল স্বাভাবিক চিত্র। তাদের মধ্যকার পারস্পরিক অবিশ্বাস, ঈর্ষা নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব, অস্ত্র ও অর্থের হিস্যা নিয়ে মনোমালিন্য বিপ্লবী দলগুলোর দুর্বলতার অতনিহিত কারণ ছিল। তারা এজন্যই একযোগে কাজ করতে পারেনি। বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার এটাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

৬৮। দীপংকর মোহাত, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৫০।

৬৯। *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৪৮।

৭০। নির্মলা ঘোষ পরে রায় হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

৭১। দীপংকর মোহাত, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৫০।

৭২। এসময় ঢাকা ও কলকাতাস্থ স্ত্রীসংঘের ঘাঁটিগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। নীলা নাগের তত্ত্বাবধানে সুনীল রায় ও নৃপেশ চক্রবর্তী কলেজ স্ট্রিটের ঘাঁটি, কুমুদিনী সিংহ ও সমরেশ সিংহ যোগীপাড়া বাইলেনের ঘাটি, রণেশ ঘোষ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাড়ি, নেপাল নাগ ও থাঁর মা ৩১ কানাই ধর লেনের ঘাটি, রেনু সেন ১১ গোয়াবাগানস্থ ছাত্রীভবন, রেবতী বর্মণ ও অন্যান্যরা ৯৩/১ বৈঠক খানা রোডের খাটি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ঢাকার ঘাঁটিগুলিতে ছিলেন লতিকা দাস, রেণুকণা সেনগুপ্ত, কেণুকণা দত্ত, হেলেনা দত্ত প্রমুখ।

৭৩। দীপংকর মোহাত, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৭৬।

৭৪। Tirtha Mondal, *op.cit*, p. 32.

৭৫। শ্যামলী গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৭৬।

৭৬। *প্রবাসী*, মাঘ, ১৩৩৮, পৃঃ ৫,৯।

৭৭। *জয়ন্তী*, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩৮, উদ্ধৃতঃ দীপংকর মোহাত, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ৬৪।

৭৮। *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০, পৃঃ ৫। ৪ চৈত্র, ১৩৪০, পৃঃ৪। ৯বৈশাখ, ১৩৪১, পৃঃ ৪-৫। ২ আষাঢ়, ১৩৪১, পৃঃ ৪। ৩০ আষাঢ়, ১৩৪১, পৃঃ ৫। ২২ ভাদ্র, ১৩৪২, পৃঃ ৫। ১৭ কার্তিক ১৩৪২, পৃঃ ৪।

৭৯। অঞ্জন বেরা, *জনযুদ্ধ পত্রিকা সন্ধিক্ষণের মুখপত্র*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ২১-২২।

৮০। *ঢাকা প্রকাশ*, ২৬ বৈশাখ, ১৩৪০, পৃঃ ৮।

৮১। *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ আশ্বিন, ১৩৪৪, পৃঃ ২।

৮২। *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, পৃঃ ৪।

৮৩। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৯৪৫, পৃঃ ৪।

৮৪। *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪, পৃঃ ৪।

৮৫। যোগেশ চন্দ্র বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কোলকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭৩।

৮৬। আশালতা সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩১।

৮৭। *জয়শ্রী*, ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্রস ১৩৩৮। দীপংকর মোহাত, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৬৪।

৮৮। জ্ঞান চক্রবর্তী, *ঢাকা জেলার কমিউনিস আন্দোলনের অতীত যুগ*, জনসাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৭২, পৃঃ ৫১।

৮৯। *প্রাগুক্ত*।

৯০। *প্রাগুক্ত*।

৯১। আত্মরক্ষা সমিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, কনক মুখোপাধ্যায়', *নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ১৯৯৩।

৯২। *জনযুদ্ধ*, ২২ মে, ১৯৪৩।

৯৩। জ্ঞান চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৮৫-৮৬।

৯৪। বিস্তারিত দেখুন, আরিফা সুলতানা, *"বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে নারী"* অপ্রকাশিত পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, *সাভার*, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃঃ ২৪২-২৪৯।